এ স্টাডি ইন স্কারলেট

আর্থার কোনান ডয়েল

এ স্টাডি ইন স্কারলেট (উপন্যাস)

(শার্লক হোমসের প্রথম কেস)

প্রথম খণ্ড

[ভূতপূর্ব মিলিটারি ডাক্তার জন এইচ ওয়াটসন এম ডি-র স্মৃতিচারণ থেকে পুনর্মুদ্রিত]

শার্লক হোমস

১৮৭৮ সালে লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ডাক্তারির ডিগ্রি নিয়ে নেটলি গিয়েছিলাম আমি সার্জন পাঠক্রম পড়বার জন্যে। সেখানকার পড়াশুনো চুকিয়ে সামরিক বাহিনীতে যোগদান করলাম অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন পদে। ইন্ডিয়ায় গিয়ে কাজ বুঝে নেওয়ার আগেই লাগল আফগান যুদ্ধ। বোম্বাই পৌঁছে শুনলাম আমাদের বাহিনী গিরিসংকটের মধ্যে দিয়ে শত্রুদের এলাকায় ঢুকে পড়েছে। অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে কোনোমতে আমিও পৌঁছোলাম কান্দাহারে। রেজিমেন্টের ডিউটি শুরু করে দিলাম তৎক্ষণাৎ।

এই অভিযানে অনেকের বরাত খুলে গেছে সম্মান পেয়েছে, পদোন্নতি ঘটেছে। আমার বরাতে জুটেছে শুধুই দুর্ভোগ। ব্রিগেড থেকে আমাকে সরানো হয়েছে। বার্কশায়ারের সঙ্গে মেইওয়ান্দের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে গিয়েছি। কাঁধে লেগেছে জিজেল বুলেট। হাড় ভেঙেছে, সাবক্লেভিয়ান ধমনী ছুঁয়ে গেছে। খুনে গাজীদের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি আর্দালি মুরের জন্যে। ঘোড়ার পিঠে ফেলে নক্ষত্রবেগে সে আমাকে নিয়ে এসেছে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে।

দারুণ যন্ত্রণা আর পরিশ্রমে আমি তখন ধুঁকছি। ওই অবস্থায় আমাকে আনা হল পেশোয়ারের সদর হাসপাতালে। অনেকটা সামলে ওঠার পর বারান্দায় বেড়াতাম, হাসপাতালের অন্যান্য ওয়ার্ডে ঘুর ঘুর করতাম। তারপরেই আক্রান্ত হলাম অভিশপ্ত ভারতীয় আন্ত্রিক জ্বরে। শরীর একেবারে ভেঙে গেল। ভীষণ কাহিল হয়ে পড়লাম। মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফিরে এলাম ইংল্যান্ডে। ইন্ডিয়া থেকে সামরিক জাহাজ ওরোন্টেজ একমাস পরে নামিয়ে দিয়ে গেল পোর্টসমাউথ বন্দরে। শরীরে তখন আমার আর কিছু নেই। সরকার ঠিক করলে আমাকে ন-মাস সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া হোক।

ইংল্যান্ডে আমার তিন কুলে কেউ নেই। পকেটে রেস্ত বলতে দৈনিক সাড়ে এগারো শিলিং বরাদ্দ। তাই এলাম লন্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সব উড়নচণ্ডীরা শেষ পর্যন্ত যেখানে এসে জোটে। উঠলাম একটা হোটেলে। কিন্তু দু-দিনেই বুঝলাম ওই টাকায় হোটেলে থাকা সম্ভব নয়। হয় আমাকে লন্ডন ছেড়ে যেতে হবে নয় জীবনযাপনের ধারা পালটাতে হবে। শেষেরটাই সহজ মনে হল। কারো বাড়িতে সস্তায় থাকা-খাওয়ার জায়গা খুঁজতে লাগলাম।

যেদিন ঠিক করলাম সস্তায় থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, সেই দিনই ক্রাইটেরিয়ন বারে দেখা হয়ে গেল স্ট্যামফোর্ডের সঙ্গে। এককালে স্ট্যামফোর্ড ছিল ডাক্তারি কাজে আমার সহযোগী–ড্রেসার। খুব একটা হৃদ্যতা অবশ্য ছিল না। কিন্তু সেদিন পেছন থেকে আমার কাঁধে টোকা মারতেই ওকে দেখে কী ভালোই যে লাগল তা বলবার নয়।

লন্ডনের ধু নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে যেন একটা মরূদ্যান। স্ট্যামফোর্ডও দেখলাম উল্লসিত হয়েছে আমাকে দেখে। আনন্দের চোটে তক্ষুনি একটা ছ্যাকড়াগাড়ি নিয়ে রওনা হলাম হলবর্ন অভিমুখে লাঞ্চ খাওয়ার জন্যে।

গাড়ির মধ্যেই স্ট্যামফোর্ড জিজ্ঞেস করল, ওয়াটসন, একী ছিরি হয়েছে তোমার? চেহারাটা তো দেখছি তক্তার মতো পাতলা আর বাদামের মতো বাদামি করে ফেলেছ।

সংক্ষেপে আমার অ্যাডভেঞ্চার-ইতিবৃত্ত শোনালাম। গাড়ি পৌঁছে গেল হলবর্নে। খেতে বসে সহানুভূতির সুরে বললে স্ট্যামফোর্ড, আহারে। এখন কী করবে ঠিক করেছ?

সস্তায় মাথা গোঁজার আস্তানা খুঁজছি!

অদ্ভুত ব্যাপার তো। আজকেই এই নিয়ে দু-বার হল শুনলাম একই ইচ্ছে।

প্রথম ইচ্ছেটা কার?

হাসপাতালের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে কাজ করে। ঘর পেয়েছে চমৎকার, কিন্তু আধাআধি বখরায় থাকবার মতো সঙ্গী পাচ্ছে না। একা খরচ বওয়ার সাধ্যও নেই।

বলো কী! খরচ আর ঘর ভাগ করতে চাইছে! আরে আমিও তো তাই চাই। একা থাকতে ভাল্লাগে না। সঙ্গী পেলে বর্তে যাব।

স্ট্যামফোর্ড মদের গেলাস হাতে নিয়ে অদ্ভুতভাবে চেয়ে রইল আমার দিকে। বললে, শার্লক হোমসকে তুমি চেনো না। চিনলে তার সঙ্গে অষ্টপ্রহর এক জায়গায় থাকতে চাইতে না।

কেন বল তো? গোলমালটা কোথায়?

তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না! লোক ভালো। বিজ্ঞানের কিছু কিছু ব্যাপার নিয়ে উৎসাহী!

মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নিশ্চয়?

না। ও যে কী চায়, সেটাই একটা রহস্য। অ্যানাটমি ভালো জানে, কেমিস্ট্রিতে তুখোড়। কিন্তু ধরাবাঁধা মেডিক্যাল ক্লাস কখনো করেনি। এলোমেলো উদ্ভট বিষয়বস্তু নিয়ে পড়াশুনা করেছে বিস্তর। বাইরে জ্ঞান ওর এত বেশি যে অনেক প্রফেসরেরও মুণ্ডু ঘুরে যায় সেই বিদ্যের নমুনা শুনলে।

লক্ষ্যটা কী জিজ্ঞেস করনি?

না; ও-লোকের পেট থেকে সহজে কথা বার করা যায় না! মুড এলে কিন্তু অন্য মানুষ–মুখে তখন তুবড়ি ছোটে।

এইরকম লোককেই দোস্ত চাই, বললাম আমি। ভাঙা শরীরে আওয়াজ উত্তেজনা আর ভালো লাগে না। আফগানিস্তানে ঢের সয়েছি বাকি জীবনটা তার ঠেলা সামলাই। আমি চাই এমন একজনের সঙ্গে থাকতে যার পড়াশুনার অভ্যেস আছে, কথাবার্তা কম বলে, প্রকৃতি শান্ত! বন্ধুটির সঙ্গে কীভাবে দেখা করা যায় বলো।

ল্যাবরেটরি গেলেই পাবে। খেয়ালি লোক তো। কয়েক সপ্তাহ হয়তো ল্যাবরেটরির চৌকাঠ মাড়াল না। তারপরেই দেখবে উদয়াস্ত পড়ে সেখানে। যদি একান্তই চাও লাঞ্চ খেয়ে যাওয়া যাবেখন।

অবশ্যই চাই, তারপর শুরু হল অন্য কথাবার্তা।

হলবর্ন থেকে বেরিয়ে ছ্যাকড়াগাড়ি ডেকে উঠে বসলাম। যেতে যেতে ভাবী বন্ধুটি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বললে স্ট্যামফোর্ড।

বললে, ওয়াটসন, শার্লক হোমসের সঙ্গে যদি তোমার বনিবনা না হয়, আমাকে কিন্তু দোষ। দিয়ো না। ল্যাবরেটরিতে মাঝে মাঝে ওকে দেখেছি এর বেশি খবর আমি রাখি না। তুমি দেখা করতে চাইছ বলেই যাচ্ছি। আমাকে পরে দুষো না।

বনিবনা না-হলে না হয় ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে। জবাব দিলাম আমি। তারপর শক্ত চোখে তাকিয়ে বললাম, স্ট্যামফোর্ড, ব্যাপার কী বল তো? তুমি মাঝে থাকতে চাইছ না কেন? খুব বদমেজাজি লোক নাকি? খুলে বলো, ঢেকো না।

হেসে ফেলল স্ট্যামফোর্ড। বললে, অনেক জিনিস বলেও বোঝানো যায় না। হোমস যেন একটু বেশি রকমের সায়েন্টিফিক আমার ধাতে সহ্য হয় না। কীরকম যেন হিমশীতল ঠান্ডা যুক্তিতে ঠাসা সঠিক জ্ঞানের পেছনে ধাওয়া করার উন্মত্ততা ওর শিরায় উপশিরায়। চামড়ার ওপর ওর নবতম আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া কী জানবার জন্যে খুব ঠান্ডা মাথায় বন্ধুর গায়ে ভেজিটেবল অ্যালকালয়েড চিমটি কেটে বসিয়ে দিতে পারে–মনের মধ্যে তিলমাত্র বিদ্বেষ না-রেখে নিজের চামড়ার ওপরেও এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে অম্লান বদনে।

সে তো ভালোই।

বাড়াবাড়ি হলেই খারাপ। যেমন ধর না কেন, কাটাছেড়া করার ডিসেকটিং রুমে যদি যাদের নিয়ে গবেষণা তাদেরকেই লাঠিপেটা করতে আরম্ভ করে, ব্যাপারটা কিম্ভুতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায় না কি?

লাঠিপেটা করে?

তাহলে আর বলছি কী! মৃত্যুর পর আঘাত কতখানি ফুটে ওঠে যাচাই করার জন্যে অমন করে। আমার নিজের চোখে দেখা!

এর পরেও বলবে সে ডাক্তারি ছাত্র নয়?

বলব বই কী। মেডিক্যাল স্টুডেন্ট তো নয়ই, সে যে কীসের স্টুডেন্ট ঈশ্বর জানেন। যাক গে ভাই, এসে গেছি। শার্লক হোমস লোক কীরকম, আলাপ করে নিজেই বুঝে নাও।

সরু গলির মধ্যে গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা খিড়কির দরজার সামনে। দরজার পরেই মস্ত হাসপাতাল। চেনা জায়গা। পথ দেখানোর দরকার ছিল না। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম টানা লম্বা করিডরে। দু-দিকের চুনকাম করা সাদা দেওয়ালে সারি সারি দরজা। একপ্রান্তে খিলেন দেওয়া একটা গলিপথ বেরিয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে কেমিক্যাল ল্যাবরেটরির সামনে।

বিরাট উঁচু ঘর। থরে থরে সাজানো অসংখ্য শিশিবোতল। চওড়া নীচু বিস্তর টেবিলে বকযন্ত্র, টেস্টটিউব আর নীলাভ শিখাচঞ্চল জ্বলন্ত বুনসেন বার্নার। ঘরের মধ্যে ছাত্র বলতে একজনই–দূরের টেবিলে হেঁট হয়ে কাজে নিমগ্ন। আমাদের পায়ের আওয়াজে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। পরক্ষণেই চেঁচিয়ে উঠল সোল্লাসে। এক হাতে একটা টেস্টটিউব তুলে ধরে চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়ে এল আমাদের দিকে, পেয়েছি। পেয়েছি। হিমোগ্লোবিনের সংস্পর্শে এলেই থিতিয়ে যাওয়ার মতো একটাই কেমিক্যাল আমি পেয়েছি। সোনার খনি আবিষ্কার করলেও বুঝি এর বেশি উল্লাস ওই মুখে ফুটত না।

আলাপ করিয়ে দিল স্ট্যামফোর্ড, ডক্টর ওয়াটসন, মি. শার্লক হোমস।

কীরকম আছেন বলুন, বলিষ্ঠ মুঠি দিয়ে আমায় করমর্দন করতে করতে বললে হোমস, ভাবতেও পারিনি ওই চেহারায় এত জোর থাকতে পারে–আফগানিস্তানে ছিলেন দেখছি।

আপনি জানলেন কী করে? অবাক হয়ে বললাম আমি।

তা জেনে কী হবে! শুকনো নীরস হেসে বললে হোমস। প্রশ্ন এখন এই হিমোগ্লোবিনকে নিয়ে। আমার আবিষ্কারটার গুরুত্ব নিশ্চয় অনুধাবন করেছেন?

রসায়নগতভাবে কৌতূহলোদ্দীপক আবিষ্কার সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে–

বলেন কী মশায়! এ-রকম প্র্যাকটিক্যাল মেডিকো-লিগ্যাল আবিষ্কার কতদিন হয়নি জানেন? রক্তের দাগ প্রমাণ করবার অকাট্য পদ্ধতি কি এর ফলে পাচ্ছেন না? আসুন! এসে দেখে যান। সাগ্রহে আমার কোটের হাতা খামচে ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল কাজের টেবিলের সামনে। টাটকা রক্ত চাই, বলতে বলতে পাট করে নিজের আঙুলেই লম্বা বডকিন ফুটিয়ে রক্ত বার করে টেনে নিল কেমিক্যাল পিপেটের মধ্যে। এবার দেখুন এক ফোঁটা রক্ত মিশিয়ে দিচ্ছি এক লিটার জলের মধ্যে। দেখতেই পাচ্ছেন রক্ত-মিশোনো জলটাকে দেখতে এখন বিশুদ্ধ জলের মতোই। রক্তের অনুপাত কিন্তু দশ লাখের এক ভাগ–তার বেশি নয়। তা সত্ত্বেও রিঅ্যাকশন আমরা দেখতে পাব।বলেই

কয়েক টুকরো সাদা ক্রিস্টাল ছুঁড়ে ফেলল জলের মধ্যে, তারপর ঢালল কয়েক ফোঁটা স্বচ্ছ তরল পদার্থ। সঙ্গে সঙ্গে ম্যাটমেটে মেহগনি রং হয়ে গেল জলটার এবং খানিকটা বাদামি ধুলো থিতিয়ে পড়ল কাচের জারের তলায়।

...হাঃ, হাঃ, হাঃ! কেমন, এবার কী বলবেন? নতুন খেলা পেয়ে বাচ্চা ছেলের হাততালি দেওয়ার মতো হাততালি দিয়ে পরমোল্লাসে বলল হোমস।

আমি বললাম, দেখে তো মনে হচ্ছে টেস্টটা খুব সূক্ষ্ম।

বিউটিফুল! বিউটিফুল! মান্ধাতার আমলের গুয়াইকাম টেস্টটা২৫ যেমন লটঘটে তেমনি অনিশ্চিত। মাইক্রোস্কোপে রক্তকণিকা পরীক্ষাও তাই। রক্তের দাগ কয়েক ঘণ্টার বাসি হলে তা পরীক্ষার আর প্রশ্নই ওঠে না। এই টেস্টে কিন্তু ধরা যাবে রক্তটা বাসি না টাটকা। টেস্টটা যদি আগে কেউ আবিষ্কার করত, মারাত্মক অপরাধে অপরাধী বহু ব্যক্তিরই বহাল তবিয়তে ধরাধামে বিচরণ বন্ধ হয়ে যেত–হাতেনাতে পেত পাপের সাজা!

তা ঠিক! স্বগতোক্তি করলাম আমি!

ক্রিমিন্যাল কেসের অনেক কিছুই নির্ভর করে একটা পয়েন্টের ওপর। খুন করার বেশ কয়েক মাস পরে হয়তো সন্দেহ এসে পড়ল খুনির ওপর। জামাকাপড় পরীক্ষা করে বাদামি দাগও পাওয়া গেল। কিন্তু সে-দাগ কাদার দাগ কী রক্তের, মরচের দাগ না

ফলের কে বলবে? সমস্যাটা নিয়ে বহু এক্সপার্টের মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছে। এখন থেকে আর ঘুরবে না। পাওয়া গেছে শার্লক হোমস টেস্ট।

বলতে বলতে চোখ জ্বলজ্বল করতে লাগল অদ্ভুত মানুষটার। হাত রাখল বুকের ওপর এবং এমনভাবে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন করল শূন্যকে লক্ষ করে যেন তার সুদূর কল্পনায় উদবেলিত হয়ে উঠেছে করতালিমুখর বিশাল জনতা।

উৎসাহ দেখে চমৎকৃত হয়ে মন্তব্য করলাম, আপনাকে অভিনন্দন জানানো উচিত।

গত বছর ফ্রাঙ্কফুর্টে ভন বিসচফের কেস হয়েছিল। এই টেস্ট যদি তখন থাকত ফাঁসি হয়ে যেত ভন বিসফের। এ ছাড়াও রয়েছে ব্রাডফোর্ডের ম্যাসন, কুখ্যাত মুলার নিউ অর্লিয়েন্সের স্যামসন আর মপেলিয়ারের লেফেভার। এক কুড়ি মামলা এখুনি বলতে পারি–প্রতিটি কেসেই অকাট্য হতে পারত এই টেস্ট।

হেসে ফেলল স্ট্যামফোর্ড। বলল, তুমি যে দেখছি একটা চলন্ত ক্রাইম ক্যালেন্ডার। এই লাইনে একটা কাগজ বার করে ফ্যালো। পুলিশের অতীত সংবাদ। ভালো চলবে।

পড়ে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে, আঙুলের ক্ষততে স্টিকিং প্লাস্টার লাগাতে লাগাতে বললে হোমস আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে, একটু সাবধান হওয়া দরকার আমার। বিষ নিয়ে কাজ করি তো। হাত বাড়িয়ে দিতে দেখি বিস্তর স্টিকিং প্লাস্টার লাগানো হাতের চারিদিকে–অ্যাসিডেও বিবর্ণ হয়ে গেছে বেশ কয়েক জায়গা।

তিন পায়ার লম্বা টুলে বসল স্ট্যামফোর্ড আর একটা টুল পা দিয়ে ঠেলে দিলে আমার দিকে। বললে, আমরা এসেছিলাম কাজ নিয়ে। ওয়াটসন বাসা খুঁজছে। তুমি বড়ো ঘ্যান ঘ্যান করছিলে ঘর ভাগাভাগি করে থাকার মতো সঙ্গী পাচ্ছো না বলে! তাই ভাবলাম তোমাদের মিলিয়ে দিই।

আমার সঙ্গে ঘর ভাগ করে থাকার কথা শুনেই কিন্তু উল্লসিত হল শার্লক হোমস। বললে, বেকার স্ট্রিটের একটা বাড়ির ওপর নজর আছে আমার। দু-জনের পক্ষে উপর্যুক্ত। কড়া তামাকের গন্ধ কি আপনার অপছন্দ?

আমি নিজে শিপ ব্র্যান্ড স্মোক করি।

চমৎকার। কেমিক্যাল নিয়ে থাকতে ভালোবাসি আমি মাঝে মাঝে এক্সপেরিমেন্টও করি। বিরক্ত হবেন না তো?

একেবারেই না।

ভেবে দেখি আর কী কী বদখেয়াল আছে আমার। মাঝে মাঝে গুম হয়ে বসে থাকি দিন কয়েক হয়তো মুখই খুলি না। ভাববেন না যেন মুখ ভারী করেছি। একলা থাকতে দেবেন দেখবেন ঠিক হয়ে যাব। এবার বলুন আপনার গলদ কী কী আছে! একসঙ্গে থাকতে যাওয়ার আগে দু-জনেরই খারাপ দিকগুলো আগে জেনে নেওয়া দরকার।

জেরার বহর দেখে না-হেসে পারলাম না। বললাম, আমি একটা বুলগের বাচ্চা পুষি। ঝগড়াঝাটি চেঁচামেচি ভালোবাসি না। নার্ভ আমার অনেক ধাক্কায় কাহিল। মাঝরাতে উঠে বসে থাকি। আর ভীষণ কুঁড়ে আমি। শরীর ভালো থাকলে আর এক ধরনের বদ স্বভাব মাথা চাড়া দেয় অবশ্য, তবে এগুলোর চাইতে সেটা বড়ো নয়।

চেঁচামেচির মধ্যে বেহালা বাজানোও ধরেন নাকি? উদবিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে হোমস।

সেটা নির্ভর করছে বাজনাদারের ওপর। ভালো বেহালা বাজনায় দেবতাও তুষ্ট হন–আর যদি আনাড়ির হাতে

খুশিতে কলকলিয়ে উঠল হোমস, ব্যাস, ব্যাস, ওতেই হবে। একসঙ্গে থাকতে পারব বলেই বিশ্বাস–যদি ঘরদোর আপনার পছন্দ হয়।

কখন দেখা যায় বলুন।

কাল দুপুরে এখানেই চলে আসুন। দু-জনে মিলে গিয়ে দেখে শুনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যাবেখন।

করমর্দন করে বললাম, তাহলে সেই কথাই রইল–কাল দুপুরে।

কেমিক্যাল পরিবৃত অবস্থায় হোমসকে রেখে আমি আর স্ট্যামফোর্ড বেরিয়ে এলাম। হেঁটে চললাম হোটেলের দিকে।

যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম স্ট্যামফোর্ডকে, আচ্ছা, আমি যে আফগানিস্তান ঘুরে এসেছি, মি. হোমস তা বুঝলেন কী করে?

দুর্বোধ্য হাসি হেসে স্ট্যামফোর্ড বললে, ওর অনেক অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে–এটা তার মধ্যে ছোটোখাটো একটা। অনেকেই অবাক হয়েছে ওর এই ক্ষমতায় অচেনা মানুষকে দেখেই হাঁড়ির খবর পর্যন্ত বলে কী করে, সে এক রহস্য।

রহস্য তো বটেই! সোৎসাহে দু-হাত ঘষতে ঘষতে বললাম, তীব্র রহস্য। এ-রকম লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞ রইলাম তোমার কাছে। জানো তো মনুষ্যত্বের প্রকৃত পর্যবেক্ষণ যে করতে পারে, মানুষ তাকে বলা যায়।

তুমি ওকে যত না পর্যবেক্ষণ করবে, তার চাইতে অনেক বেশি ও করবে তোমাকে। তোমার কাছে শার্লক হোমস একটি গ্রন্থিল বাঁধা হয়ে থাকবে চিরকাল–কিন্তু তোমার ভেতর পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে ওর চোখে। চললাম।

এসো, বলে ফিরে এলাম হোটেলে। মন কিন্তু পড়ে রইল নতুন বন্ধুটির প্রতি।

অবরোহমূলক সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান

পূর্ব-ব্যবস্থা মতো পরের দিন দু-জনে গিয়ে দেখলাম ২২১ বি বেকার স্ট্রিটের বাসাবাড়ি। খান দুই রুচিসম্মত শোবার ঘর। একটা বড়োসড়ো আলো-হাওয়াযুক্ত বসবার ঘর। আসবাবপত্র দিয়ে ভালোভাবে সাজানো বসবার ঘরে দুটো বড়ো বড়ো জানলা। ঘর যেমন পছন্দ হল, ভাড়াও তেমনি পকেটে কুলিয়ে গেল। দুই বন্ধু ভাগাভাগি করে নিলে গায়ে লাগবে না। সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্তা পাকা করে দখল নিলাম বাড়ির। সেই দিনই সন্ধ্যায় হোটেল থেকে জিনিসপত্র নিয়ে এলাম আমি। শার্লক হোমস এল পরের দিন সকালে সঙ্গে বেশ কয়েকটা বাক্স আর পোর্টম্যান্টো। দু-একদিন গেল জিনিসপত্র গোছাতে। তারপর গুছিয়ে বসলাম নতুন পরিবেশে।

হোমসের সঙ্গে একত্রে অবস্থান দুর্বিষহ নয় মোটেই। প্রকৃতি খুব শান্ত, প্রাত্যহিক অভ্যেস নিয়মবদ্ধ। রাত দশটার পর জাগতে দেখিনি। সকালে আমার ঘুম ভাঙবার আগেই উঠে পড়ত–ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়ত বাইরে। মাঝে মাঝে সারাদিন কাটাত কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে, কখনো শব ব্যবচ্ছেদ কক্ষে, কখনো পদব্রজে শহর পরিক্রমায় নীচের মহলেই টো-টো করতে যেত বেশির ভাগ। কাজের ঝোঁক চাপলে এনার্জি যেন ফুরোত না আবার কখনো দিনের পর দিন মড়ার মতো পড়ে থাকত বসবার ঘরে সোফায়– একদম কথা বলত না, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গায়ের একটা পেশিও নাড়াত না। এই সময়ে একটা স্বপ্নাচ্ছন্ন শূন্যগর্ভ চাহনি দেখেছি ওর চোখে। জীবন পরিচ্ছন্ন আর স্বভাব-প্রকৃতি শান্ত না-হলে ধরে নিতাম নিশ্চয় মাদক দ্রব্যের নেশাও আছে।

যতই দিন যায়, ততই আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে ওর সম্বন্ধে। জীবনে ওর লক্ষ্য কী, এই রহস্য ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে আমার মনের মধ্যে। যে কখনো খুঁটিয়ে দেখে না–ভাসা-ভাসা দেখা যার স্বভাব–সে-লোকও ওকে দেখলে আকৃষ্ট হবে–এমনি আশ্চর্য চেহারা আর ব্যক্তিত্ব আমার নয়া সঙ্গীটির। লম্বায় ছ-ফুটের একটু বেশি কিন্তু এত কৃশ যে মনে হয় আরও দীর্ঘ। দুই চোখ মর্মভেদী এবং শানিত–আচ্ছন্ন অবস্থায় পড়ে থাকার সময় ছাড়া। পাতলা বাজপাখির মতো নাকখানার মধ্যে প্রচ্ছন্ন সদাসতর্কতা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস। চৌকোনা প্রকট চোয়ালের মধ্যেও নিহিত সুগভীর আত্মপ্রত্যয় আর মনের দৃঢ়তা। হাত দু-খানা অ্যাসিড, কেমিক্যাল আর কালিতে বিবর্ণ। অথচ এই হাতেরই সাধারণ সংবেদনশীলতা আর সূক্ষ্মতা লক্ষ করেছি ভঙ্গুর ফিলজফিক্যাল যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করার সময়ে।

পাঠক হয়তো আমাকে অনধিকার চর্চার দোষে দোষী করবেন হোমস সম্বন্ধে আমার আতীব্র কৌতূহলের জন্যে। আমি স্বীকার করছি শার্লক হোমস উদগ্র আগ্রহের সঞ্চার করেছিল আমার মধ্যে নিজের সম্বন্ধে কথা উঠলেই মুখ বুজে থাকতে চেয়েছে সে এবং আমি প্রতিবারেই সেই প্রাচীর ভাঙবার বৃথা চেষ্টা করেছি। আমাকে দোষী প্রতিপন্ন করার আগে কিন্তু খেয়াল রাখবেন আমার জীবনে লক্ষ্য বলে কিছুই নেই–মনোযোগ আকর্ষণ করার মতোও কিছু নেই। আবহাওয়া ভালো না-থাকলে ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে যখন-তখন বাইরে বেরোতে পারতাম না–বন্ধুবান্ধবও কেউ ছিল না যে দর্শন দান করে একঘেয়েমি কাটিয়ে যাবে। এই পরিস্থিতিতে সঙ্গীটির জীবনরহস্য যথেষ্ট আগ্রহের খোরাক জুটিয়েছিল আমার মধ্যে বেশির ভাগ সময় ব্যয় করতাম সেই রহস্য মোচনে।

হোমস মেডিক্যাল স্টুডেন্ট নয়। ও নিজেই তা স্বীকার করেছে–স্ট্যানফোর্ডের অনুমান অভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞান-জগতে প্রবেশের ইচ্ছেও নেই—বিজ্ঞানের ডিগ্রি অর্জনের প্রচেষ্টাও নেই। তা সত্ত্বেও কয়েকটা বিষয়ে ওর আন্তরিক আগ্রহ লক্ষ করার মতো এবং খ্যাপামিটুকু বাদ দিলে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে ওর জ্ঞান এতই ব্যাপক আর গভীর যে তাক লেগে যাওয়ার মতো। জীবনে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য না-থাকলে এভাবে কেউ খাটে না, নিজেকে তৈরি করে না এবং বিশেষ জ্ঞানের ভাণ্ডার এভাবে বাড়িয়ে চলে না। শৃঙ্খলাহীন অধ্যয়নে অসাধারণ হওয়া যায় না–সঠিক পড়াশুনা থাকা চাই। অকারণে কেউ এভাবে ছোটেখাটো বিষয় নিয়েও মনকে ভারাক্রান্ত করে না।

শার্লক হোমসের জ্ঞান যেমন সুবিপুল, অজ্ঞানতাও তেমনি সুগভীর দুটোই সমান আশ্চর্যজনক। সমসাময়িক দর্শন, সাহিত্য আর রাজনীতির কোনো খবরই সে রাখে না। আমার মুখে টমাস কারলাইলের নাম শুনে অত্যন্ত অকপটভাবে জিজ্ঞেস করলে কে এবং তার এত নামডাক কী কারণে। চরম বিস্মিত হলাম যেদিন জানলাম কোপারনিকাসের থিয়োরি কী জিনিস তা সে জানে না এবং সৌরজগতের কী নামে ক-টা গ্রহ আছে সে-খবরও রাখে না।

পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে–এ-তত্ত্ব ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনো সুসভ্য মানুষ জানে—একি ভাবা যায়, না বিশ্বাস করা যায়? কী সাংঘাতিক ব্যাপার।

আমার আঁতকে-ওঠা বিস্ময়বোধকে দেখে মুচকি হেসে বলেছিল হোমস, খুব অবাক হয়েছ দেখছি। জেনে যখন ফেলেছি এখন থেকে চেষ্টা করব ভুলে যাওয়ার।

ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে কী হে।

আমার মতে মানুষের মগজটা আদতে একটা খালি কুঠরি। দরকার মতো আসবাবপত্র দিয়ে সাজাতে হয়। বোকারাই যা পায় তাই দিয়ে মগজ ঠেসে রেখে দেয় গুদোম ঘরের মতো হাবিজাবি এন্তার জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকে থাকার ফলে দরকার মতো আসল জিনিসটি খুঁজে পেতে বেগ পায়। কিন্তু পাকা কারিগর এ-ব্যাপারে ভারি হুঁশিয়ার। ফালতু জ্ঞান ব্রেন কুঠরিতে ঢোকাতে নারাজ। কাজের যন্ত্রটি ছাড়া মাথায় কিছুই রাখে না এবং যে-কটি যন্ত্র রাখে–বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দেয়। মগজ-কুঠরির দেওয়াল রবারের মতো টেনে বাড়ানো যায় এবং যত খুশি জ্ঞান ঠাসা যায়–এ-ধারণা কিন্তু সবই ভুল। বাজে জিনিস ঠাসতে গিয়ে কাজের জিনিসগুলো মানুষ ভুলে যায় এই কারণেই... আগের জ্ঞান আর মনে করতে পারে না। অদরকারি জ্ঞান দরকারি জ্ঞানকে গুতিয়ে বার করে দিয়ে নিজের ঠাঁই করে নিতে যাতে না-পারে–কারিগরের সজাগ নজর থাকা দরকার সেদিকে!

প্রতিবাদের সুরে বললাম, তাই বলে সৌরজগৎ কী জিনিস তা জানবে না।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে হোমস বললে, জেনে আমার লাভটা কী? সূর্যকে প্রদক্ষিণ না-করে যদি চন্দ্রকেই প্রদক্ষিণ করতাম, আমার কাজের দিক দিয়ে তার কানাকড়ির দামও থাকছে কি?

এই হল সুবর্ণসুযোগ কাজটা কী জিজ্ঞেস করবার জন্যে মুখ চুলবুল করে উঠলেও জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। পরে কথাগুলো মনে মনে তোলপাড় করে নিজেও একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা করলাম। উদ্দেশ্য সিদ্ধি যে-জ্ঞানে হয় না, সে-জ্ঞান নাকি ওর নিষ্প্রয়োজন। তাই যদি হয়, সে-জ্ঞান ও মগজে ঢুকিয়েছে, তার প্রত্যেকটাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে ওর প্রয়োজন। মনে মনে ছকে নিলাম ওর বিবিধ জ্ঞানের ফিরিস্তি। শেষকালে কাগজ পেনসিল নিয়ে লিখে ফেললাম। ফর্দের দিকে তাকিয়ে কিন্তু হাসি পেল শেষপর্যন্ত।

শার্লক হোমসের দৌড় কদ্দূর।

১. সাহিত্যজ্ঞান... শূন্য।

২. দর্শনজ্ঞান... শূন্য।

৩. জ্যোতির্বিজ্ঞান... শূন্য।

৪. রাজনীতিজ্ঞান... নগণ্য।

৫. উদ্ভিদ বিদ্যা-জ্ঞান... বিবিধ। বেলেডোনা, আফিং আর বিষবিজ্ঞানে তুখোড়। বাগান করার ব্যাপারে ডাহা আনাড়ি।

৬. ভূতত্ত্ব-জ্ঞান... বাস্তবজ্ঞান আছে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। রকমারি মাটির চেহারা দেখেই বলে দেয় কোনটা কী মাটি। বেড়িয়ে আসার পর ট্রাউজার্সের মাটির দাগ দেখিয়ে বলে লন্ডন শহরের ঠিক কোন জায়গায় কোন মাটিটা পাওয়া যায়।

৭. রসায়ন-বিদ্যা-জ্ঞান... সুগভীর।

৮. শারীরবিদ্যা-জ্ঞান... নির্ভুল, কিন্তু পদ্ধতিবিহীন।

৯. চাঞ্চল্যকর সাহিত্য-জ্ঞান... প্রচুর। বর্তমান শতাব্দীতে যত রকমের বিকট কাহিনি আছে, সব যেন কণ্ঠস্থ।

১০. ভালো বেহালা বাজায়।

১১. তরবারি খেলা, লাঠি আর মুষ্টিযুদ্ধে ওস্তাদ।

১২. ব্রিটিশ আইনের বাস্তব জ্ঞানে বেশ দখল আছে।

লিস্টটা এই পর্যন্ত লেখবার পর হতাশ হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম আগুনে। নিজের মনেই বললাম, এই জাতীয় জ্ঞানের ফিরিস্তির মাপকাঠি দিয়ে জীবনের লক্ষ্য আবিষ্কার করার চেষ্টাই পণ্ডশ্রম।

বেহালায় ওর দক্ষতার উল্লেখ করেছি আগে। সত্যিই হাত ভালো, অসাধারণ বাজায়। কিন্তু অন্যান্য কৃতিত্বের মতো বাজনা বাজানোটাও কীরকম যেন খ্যাপাটে। আমার অনুরোধে ভালো ভালো সুর বাজিয়ে শুনিয়েছে–খুবই কঠিন সুর। কিন্তু নিজে বাজানোর সময়ে আদৌ কোনো সুর তোলবার ধার দিয়েও যায় না। কোনো কোনো সন্ধ্যায় চেয়ারে আড় হয়ে বসে কোলের ওপর বেহালা রেখে দু-চোখ মুদে এলোমেলো ঝংকার তুলে যায় আঙুলের ঘায়ে। কখনো সে-ঝংকার সুরেলা বিষণ্ণ। কখনো ফ্যানটাসটিক প্রসন্ন। ও-সুর যে মনের ভাবনার প্রতিফলন, তা বোঝা যায়। শুধু বোঝা যায় না, সুরের প্রভাব ভাবনায় পড়ছে না, স্রেফ খেয়ালখুশির বশে বিচিত্র বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে। তারপর অবশ্য আমার ধৈর্যের পুরস্কার স্বরূপ আমারই প্রিয়

অনেকগুলো মন মাতাল করা সুর এমনভাবে পরের পর বাজিয়ে যায় যে বলবার নয়।

প্রথম দু-এক হপ্তা কেউ এল না বাড়ি বয়ে দেখা করতে। ভাবলাম আমার মতো আমার সঙ্গীটিও নির্বান্ধব। অচিরে দেখলাম, তা নয়। পরিচিত তার অনেক এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ। বেঁটে চেহারার একটা লোক আসত, নাম তার লেসট্রেড। মুখটা ইঁদুরের মতো, গায়ের রং ফিকে বাদামি, চোখ কালো। হপ্তায় হপ্তায় তিন চারবার আসা চাই। একদিন সকালে ফ্যাশন দুরন্ত সাজপোশাক পরা এক তরুণী এল, আধ ঘণ্টার মতো

কাটিয়ে গেল হোমসের সঙ্গে। সেই দিনই বিকেল নাগাদ ভীষণ হন্তদন্ত হয়ে এল নোংরা পোশাক পরা আধবুড়ো সাদা চুলো একটা লোক। দেখতে অনেকটা ইহুদি ফেরিওয়ালার মতো প্রায় সঙ্গেসঙ্গে আলুথালু বেশে ঘরে ঢুকল একজন প্রৌঢ়া। আর একবার এল শুভ্রকেশ এক ভদ্রলোক তারপরেই মখমল ইউনিফর্ম পরা একজন রেলের কুলি। এরা এলেই শার্লক হোমস তাদের নিয়ে বসবার ঘরে একা থাকতে চাইত আমাকে যেতে হত শোবার ঘরে। প্রতিবারই অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নিত আমার এই অসুবিধার জন্যে। ঘরটাকে বসবার ঘর করছিএরা আমার মক্কেল। শুনেই কিন্তু অদম্য ইচ্ছে হত ব্যবসাটা কী ধরনের জিজ্ঞেস করার। কিন্তু প্রতিবারই সৌজন্যবশত প্রশ্নটা মুখে আটকে যেত। যে-লোক যেচে বলতে চায় না প্রাণের কথা–তাকে জিজ্ঞেস করতে মন চাইত না কিছুতেই। ভাবতাম নিশ্চয় কোনো জুতসই কারণ আছে যার জন্যে এ-প্রসঙ্গ তুলতে চায় না সে। একদিন কিন্তু ঘুরিয়ে নাক দেখানোর আর দরকার হল না–সরাসরি নিজেই সব বলে বসল হোমস।

সেদিনটা ৪ মার্চ। দিনটা ভালো করে মনে আছে একটা কারণে। অন্যদিনের চেয়ে সেদিন একটু আগেই ঘুম থেকে উঠেছিলাম। দেখি তখনও প্রাতরাশ সাঙ্গ হয়নি শার্লক হোমসের। আমি বেলায় উঠি বলেই ল্যান্ডলেডি তখনও আমার খাবার সাজায়নি, কফিও করেনি। মানুষ মাত্রেই এ-পরিস্থিতিতে অকারণে খিটখিটে হয়ে ওঠে। আমিও ঘণ্টা বাজিয়ে জানিয়ে দিলাম যে আমি তৈরি। তারপর একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগলাম সময় কাটানোর জন্যে। টেবিলে বসে নিঃশব্দে টোস্ট চিবিয়ে চলল শার্লক হোমস। এমন সময়ে একটা প্রবন্ধের শিরোনামায় পেনসিল চিহ্ন দেখে চোখ বুলিয়ে গেলাম প্রথম থেকে।

প্রবন্ধর নামটি বেশ গালভরা জীবনী গ্রন্থ। লেখক মনে করেন, চোখ থাকলেই শুধু হয় , সুসংবদ্ধ এবং চুলচেরা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাই চোখে পড়ুক না কেন, তা থেকে অনেক কিছুই জানা যায়। বিষয়টা কিন্তু আমার কাছে ধড়িবাজি আর অযৌক্তিকতার সংমিশ্রণ বলেই মনে হল। অসংগতি আর নির্বুদ্ধিতাকে বেশ চালাকি করে পেশ করা হয়েছে। যুক্তির ধার বেশ তীক্ষ্ণ, ফঁক নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তগুলো যেন অতিরঞ্জিত। যেকোনো মানুষের মুহূর্তের ভাবপ্রকাশ দেখেই লেখক তার মনের চিন্তা ধরে ফেলতে পারেন। চকিতের দৃষ্টিপাত, ক্ষণেকের পেশি কুঞ্চন দেখে নাকি মনের একদম গভীরে কী চিন্তার খেলা চলছে তা বলা যায়। পর্যবেক্ষণে যিনি অভ্যস্ত, বিশ্লেষণে যিনি চোস্ত, তাকে ধোঁকা দেওয়া অসম্ভব। ইউক্লিডের জ্যামিতিক সিদ্ধান্ত যেমন অনড়, অকাট্য এবং অভ্রান্ত লেখকের সিদ্ধান্তও যেন তাই। ব্যাপারটা যে বোঝে না সে কিন্তু আঁতকে ওঠে। পদ্ধতিটা জানা নেই বলেই মনে করে লেখক বুঝি জাদুকর, তন্ত্রমন্ত্রে পোক্ত, ডাকিনীবিদ্যায় ওস্তাদ। আসলে যে যুক্তি আর পর্যবেক্ষণের ধাপ পেরিয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া–তা বোঝে না।

লেখক লিখেছেন–নায়াগারা বা আটলান্টিক না-দেখে অথবা এই দুইয়ের অস্তিত্ব যে আছেই তা না-জেনেই এক ফোঁটা জল বিশ্লেষণ করে যুক্তিবিদ্যায় পণ্ডিত যে কেউ বলে দিতে পারেন নায়াগারা আর আটলান্টিকের অস্তিত্ব আছে। ঠিক তেমনি সব জীবনই শৃঙ্খলে গ্রথিত। একটা আংটা যদি জানা যায়, নৈয়ায়িকের মতো তর্কবিদ্যা দিয়ে গোটা জীবনটাকেই অনুমান করে নেওয়া যায়। সিদ্ধান্ত ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান চৌষট্টি কলার মতোই একটা আর্ট, একটা শিল্প। দীর্ঘ অধ্যবসায় আর সহিষ্ণুতার ফলেই আয়ত্ত করা

সম্ভব। এটাও ঠিক যে এ-বিদ্যায় চরমোৎকর্ষ অর্জন করার মতো দীর্ঘ জীবন এই মরলোকে কারোর নেই। মন আর বিবেকের সমস্যাই সবচেয়ে কঠিন। তাই অনুসন্ধিৎসুর উচিত এগুলো আয়ত্ত করার আগে প্রাথমিক সমস্যাগুলোর সমাধানে আগে মন দেওয়া। পাশের মানুষের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে জানতে চেষ্টা করুন সে কী কাজ করে, অতীত ইতিহাস কী। ছেলেমানুষি মনে হলেও এই চর্চার ফলেই কিন্তু পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার ধার বৃদ্ধি পায়, ঠিক কীভাবে খুঁজলে কোন জিনিসটি পাওয়া যাবে–সে-ক্ষমতা আপনা থেকে চোখ আর মগজের মধ্যে এসে যায়। আঙুলের নখ, কোটের হাতা, বুটজুতো, প্যান্টের হাঁটু তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের কড়া, চোখমুখের চাহনি, শার্টের হাতা দেখেই যেকোনো ব্যক্তির জীবিকা বলে দেওয়া যায়। এই সবকিছুর সম্মিলিত ফল অভিজ্ঞ এবং দক্ষ তদন্তকারীর উপকারে আসবে না–এমন কথা কল্পনাও করা যায় না।

দমাস করে ম্যাগাজিন খানা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললাম বিষম বিরক্তিতে, প্রলাপ বকুনির আর জায়গা পায় না? জীবনে এমন রাবিশ আমি পড়িনি।

হল কী। শুধোয় শার্লক হোমস।

আরে, এই প্রবন্ধটার কথা বলছি, ব্রেকফাস্ট খেতে তখন বসে পড়েছিলাম বলেই ডিম খাওয়ার চামচ দিয়ে ম্যাগাজিনটা দেখিয়ে আমি বললাম। আমি তো দেখছি প্রবন্ধটা তুমিও পড়েছ–পেনসিলের দাগও দিয়েছ। লেখাটায় মুনশিয়ানা আছে স্বীকার করছি। কিন্তু গা জ্বলে যায় বিষয়বস্তুর জন্যে। ঘরে বসে যারা ধাঁধার সমাধান করে সময় কাটায় এ-প্রবন্ধ তাদের কারোর লেখা। অবাস্তব লেখা। রেলের থার্ড ক্লাস কামরায় নীচুতলায় ভিড়ে

চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে যাচ্ছে লোকটাকে মুখ আর চেহারা দেখে কার কী পেশা বলতে গিয়ে জিভ

বেরিয়ে যাবেখন বাছাধনের। যত্তোসব বাজে বাকতাল্লা!

প্রশান্ত কণ্ঠে হোমস শুধু বললে, বাজি ধরলে কিন্তু তুমিই হারবে। তা ছাড়া, প্রবন্ধটা আমারই লেখা।

তোমারই লেখা!

হ্যাঁ, আমারই লেখা। পর্যবেক্ষণ আর অনুমান–চোখ দিয়ে দেখে অবরোহণমূলক সিদ্ধান্তে আসার প্রবণতা–দুটোই রয়েছে আমার মধ্যে। থিয়োরিটা উদ্ভট আর কাল্পনিক মনে হতে পারে। কিন্তু অতিশয় বাস্তব। এত বাস্তব যে আমার রুজিরোজগার নির্ভর করে এর ওপর।

কীভাবে? আপনা হতেই প্রশ্নটা বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে।

আমার একটা পেশা আছে। আমার বিশ্বাস এ-পেশায় পৃথিবীতে আমি ছাড়া কেউ নেই। আমি কনসাল্টিং ডিটেকটিভ। জানি না মানেটা বুঝতে পারলে কিনা। লন্ডন শহরে অনেক সরকারি ডিটেকটিভ, অনেক প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছে। এরা যখন ভুল করে, আমার কাছে আসে, আমি ওদের ভুল শুধরে দিয়ে ঠিক লাইন দেখিয়ে দিই। সাক্ষ্যপ্রমাণ

আমার সামনে হাজির করে, আমি অপরাধ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে আমার জ্ঞান বিদ্যের জোরে সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে দিই। সব কুকর্মের মধ্যেই একটা মিল থাকে, পারিবারিক সাদৃশ্যও বলতে পার, একহাজার কুকর্ম যদি তোমার নখদর্পণে থাকে, এক হাজার এক নম্বর রহস্যটা কী ধরনের কুকর্ম, তা বলতে না-পারাটাই বরং অদ্ভুত। লেসট্রেড নামজাদা ডিটেকটিভ। সম্প্রতি একটা জালিয়াতি কেসে নিজে জালে জড়িয়ে গিয়েছিল, এত ঘনঘন আসছিল সেই কারণেই।

অন্য লোকগুলো?

ওদের বেশির ভাগকেই পাঠিয়েছে প্রাইট তদন্ত সংস্থা। প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ঝামেলায় জড়িয়েছে। আমি ওদের কথা শুনি, তারপর ওরা আমার মন্তব্য শোনে। ওদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, আমি দক্ষিণা পকেটে পুরি।

তার মানে কি বলতে চাও অন্য লোকে অকুস্থলে গিয়ে চোখে দেখে কানে শুনেও যা জানেনি, তুমি স্রেফ ঘরে বসে তা জেনে ফ্যালো?

হ্যাঁ তা পারি। ও-ব্যাপারে আমার একটা সহজাত ক্ষমতা আছে। মাঝে মাঝে আমাকে ছুটোছুটি করতে হয় নিজের চোখে দেখতে হয়। অনেকরকম বিশেষ জ্ঞান আমি জানি। এইসব জ্ঞান প্রয়োগ করি সমস্যায় এবং অদ্ভুত ফল পাই। প্রবন্ধে অবরোহ প্রণালীর যে-নিয়মগুলো লিখেছি, যা পড়ে নাক সিটিয়ে অনেক ঝাল-টক মন্তব্য করলে, আমার কাছে

তা অমূল্য এবং অত্যন্ত বাস্তব। পর্যবেক্ষণ আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি। প্রথম সাক্ষাতে তোমাকে বলেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ শুনে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে।

কারো মুখে শুনেছিলে নিশ্চয়। মোটেই না। কিন্তু আমি জানতাম তুমি আফগানিস্তান ঘুরে এসেছ। অনেক দিনের অভ্যেস আর চর্চার ফলে একটার পর একটা চিন্তা এত দ্রুত মাথার মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়েছিল যে তোমাকে দেখামাত্র অমোঘ সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছি–মাঝের ধাপগুলো সম্বন্ধে সজাগ থাকিনি। ধাপগুলো কী, এবার তা বলছি। ধারাবাহিক যুক্তিগুলো শুনলেই বুঝবে কী করে তুমি আফগানিস্তান ফেরত। ভাবলাম, ভদ্রলোকের চেহারা ডাক্তারের মতো কিন্তু হাবভাব মিলিটারি। নিঃসন্দেহে আর্মি ডাক্তার। চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে স্বাভাবিক রং নয়–কেননা কবজি বেশ ফর্সা, তার মানে ভদ্রলোক বিষুবরেখা বরাবর কোনো জায়গায় ছিলেন। চোখ-মুখ উদ্ভ্রান্ত, শীর্ণ, কাহিল–তার মানে প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। বাঁ-হাতটাও দেখছি জখম হয়েছে। হাতটা অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় আড়ষ্টভাবে উঁচু করে রয়েছেন। ক্রান্তীয় রেখা বরাবর কোনো অঞ্চলে থাকলে একজন মিলিটারি ডাক্তারের পক্ষে এত কষ্ট সওয়া এবং হাত জখম হওয়া সম্ভব। অবশ্যই আফগানিস্তানে১৮। এতগুলো চিন্তা করতে কিন্তু এক সেকেন্ড সময়ও লাগেনি। তাই সঙ্গেসঙ্গে মন্তব্য করেছিলাম তুমি আফগানিস্তান ফেরত। শুনে অবাক হয়েছিলে।

হেসে হেসে বললাম, কী সোজা। ঠিক এডগার অ্যালেন পো-র স্টুপির মতো। গল্পের গোয়েন্দারা যে বাস্তবে সম্ভব তা জানা ছিল না।

উঠে দাঁড়িয়ে তামাকের পাইপ ধরিয়ে শার্লক হোমস বললে–স্টুপির সঙ্গে আমার তুলনা করছ নিশ্চয় প্রশংসা করার জন্যে। আমার মতে উঁপি খুবই নিকৃষ্ট শ্রেণির জীব। মিনিট পনেরো চুপচাপ থাকার পর বন্ধুর চিন্তাটাকে দুম করে বলে দেওয়ার মধ্যে তোক দেখানো বাহাদুরি আছে ঠিকই, কিন্তু গভীরতা নেই। পো যা কল্পনা করতে চেয়েছিলেন, পুঁপি তা আদৌ নয়।

গ্যাবোরিয়র বই পড়েছ? লেকক-কে আদর্শ ডিটেকটিভ বলে মনে কর?

শ্লেষের হাসি হাসল শার্লক হোমস। রাগত স্বরে বলল, লেকক হচ্ছে একটা যাচ্ছেতাই রকমের আনাড়ি ডিটেকটিভ। এনার্জি ছাড়া লেককের নিজস্ব বলে আর কিছুই নেই। বইটা পড়ে শরীর পর্যন্ত খারাপ হয়ে গিয়েছিল আমার। সমস্যাটা কী? একজন অজ্ঞাতনামা কয়েদিকে শনাক্ত করা–এই তো? চব্বিশ ঘণ্টায় আমি তা পারতাম। লেকক নিয়েছে ছ-মাস। তদন্ত করতে গিয়ে কী কী বর্জন করা দরকার এই নিয়ে পাঠ্যপুস্তক লিখলে গোয়েন্দাগুলোর কিছুটা শিক্ষা হত!

আমার প্রাণপ্রিয় দুটো চরিত্রকে এইরকম উদ্ধতভাবে ধূলিসাৎ করে দেওয়ায় হাড়পিত্তি জ্বলে গেল আমার। জানালার সামনে গিয়ে যানবাহন পথিক সরগরম রাস্তার দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম, হতে পারে লোকটা খুবই ধূর্ত, কিন্তু দাম্ভিক।

কুঁদুলে গলায় হোমস বললে, আজকাল আর ক্রাইম নেই, ক্রিমিন্যালও নেই। এ-পেশায় তাই ব্রেন থাকলেও তা কাজে লাগে না। আমি জানি আমার যা আছে তাই দিয়ে বিখ্যাত

হতে পারি। গোয়েন্দাগিরিতে আমার মতো এত পড়াশুনা আর সহজাত প্রতিভা এই মুহূর্তে কারো নেই কোনোকালে ছিলও না। কিন্তু লাভ কী বলতে পার? গোয়েন্দাগিরি করবার মতো ক্রাইম নেই, যা আছে তা এত স্বচ্ছ, স্পষ্ট মোটিভসহ আনাড়ির নষ্টামি যা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের যেকোনো অফিসারও সমাধান করে ফেলতে পারে।

লোকটার হামবড়াই দেমাকি কথাবার্তায় মেজাজ তখন এত খিচড়ে গিয়েছে যে ভাবলাম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা যাক।

নীচের রাস্তায় উলটো দিকে একটা লোক হাতে একটা নীল রঙের বড়ো খাম নিয়ে উদবিগ্নভাবে বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে হাঁটছিল। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ চেহারা। পোশাক সাদাসিদে আর পাঁচটা লোকের মতোই। নিশ্চয় চিঠি পৌঁছে দিতে এসেছে। আঙুল তুলে বললাম, লোকটা কাকে খুঁজছে?

সঙ্গেসঙ্গে শার্লক হোমস বলে উঠল, রিটায়ার্ড জাহাজি সার্জেন্টের কথা বলছ?

মিথ্যের জাহাজ! জালিয়াত কোথাকার! মনে মনেই বললাম আমি। জানে যে অনুমানটা যাচাই করতে পারব না।

কথাটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই নীচের তলার লোকটার চোখ পড়ল আমাদের বাড়ির ঠিকানায়। তক্ষুনি রাস্তা পেরিয়ে এসে টোকা মারল দরজায়। নীচতলায় শুনলাম গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসার ভারী পদশব্দ।

ঘরে ঢুকে খামখানা আমার বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, মি. শার্লক হোমসের চিঠি।

শার্লক হোমসের আত্মম্ভরিতা আর দর্প চূর্ণ করার এই হল সুবর্ণসুযোগ। এ-সুযোগ যে আমি পেয়ে যাব, একটু আগেই মহাপণ্ডিতের মতো দুম করে কথাটা বলার সময়ে হোমস নিশ্চয় তা কল্পনাও করতে পারেনি। খুব ভদ্র, নম্র, অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করলাম পত্রবাহককে,–ওহে, কী করা হয় তোমার?

আজ্ঞে দারোয়ানি। উর্দিটা মেরামত করতে দিয়েছি।

বন্ধুবরের দিকে বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করে শুধোলাম, আগে কী করতে?

সার্জেন্ট! রয়াল মেরিন লাইট ইনফ্যান্ট্রি। আর কিছু বলবেন? রাইট, স্যার।

খটাস করে বুট ঠুকে হাত তুলে স্যালুট করে অন্তর্হিত হল অবসরপ্রাপ্ত জাহাজি কর্মচারী।

লরিস্টন গার্ডেন্স রহস্য

বন্ধুবরের থিয়োরি যে এতখানি প্র্যাকটিক্যাল, তার নতুন প্রমাণ পেয়ে সত্যিই হকচকিয়ে গেলাম। ওর পর্যবেক্ষণ আর বিশ্লেষণ ক্ষমতার ওপর বহুগুণে শ্রদ্ধা বেড়ে গেল আমার। খানিকটা সন্দেহ তবু গেল না মন থেকে। কে জানে হয়তো পুরো জিনিসটাই সাজানো আমার মন ধাঁধিয়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমাকে হকচকিয়ে দিয়ে তার কী উদ্দেশ্য তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখি চিঠি পড়া সাঙ্গ হয়েছে হোমসের। গালা-চকচকে শূন্যগর্ভ চোখে কী যেন ভাবছে–মন আর এখানে নেই।

কী করে বুঝলে বল তো? জিজ্ঞেস করলাম।

কী বুঝলাম? খিটখিটে গলায় বলল ও।

লোকটা রিটায়ার্ড জাহাজি সার্জেন্ট?

তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। অভদ্রভাবে বলে উঠল হোমস। তারপরেই মৃদু হেসে বললে, রুক্ষতার জন্যে ক্ষমা চাইছি। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে দিলে কিনা। যাকগে সে-কথা। তুমি তাহলে সত্যিই দেখনি লোকটা রিটায়ার করা জাহাজি সার্জেন্ট কিনা?

একেবারেই না।

কী করে জানলাম তা বুঝিয়ে বলার চেয়ে জানাটা অনেক সোজা! দুয়ে দুয়ে জুড়লে চার কী করে হয় যদি প্রমাণ করতে বলা হয় তোমাকে ফাপরে পড়বে বই কী। চার যে হয়– তা কিন্তু তুমি জান। লোকটা রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে থাকলেও হাতের উলটো দিকে উল্কি চিহ্নটা চোখে পড়েছিল। নীল রঙের বিরাট একটা নোঙর অর্থাৎ জাহাজি গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। চলাফেরা হাবভাব মিলিটারি ধরনের গালপাট্টা জোড়াও জাহাজি নাবিকদের মতো। তাহলে জাহাজ আর সমুদ্র মাথায় এসে গেল। হাবভাব আত্মমর্যাদা সম্পন্ন কর্তৃত্বব্যঞ্জক। মাথা বেঁকিয়ে ছড়ি দোলানোর কায়দা নিশ্চিত লক্ষ করেছ। দৃঢ় সংকল্প, সচ্চরিত্র, মধ্যবয়স্ক মুখেই তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে নিমেষে বুঝলাম সে সার্জেন্ট।

ওয়ান্ডারফুল! বললাম সহর্ষে।

সামান্য ব্যাপার, মুখে বললেও হোমসের চোখ দেখে মনে হল আমার বিস্ময়বোধ আর প্রশংসাজ্ঞাপনে সে বিলক্ষণ খুশি হয়েছে। এইমাত্র বলেছিলাম ক্রিমিন্যালের অভাব ঘটেছে। ধারণাটা যে ভুল এই চিঠি তার প্রমাণ, বলে দারোয়ানের আনা চিঠিটা ছুঁড়ে দিল আমার দিকে।

চোখ বুলিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম, আরে সর্বনাশ ! এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার!

খুব একটা সাধারণ ব্যাপার মনে হচ্ছে না। প্রশান্ত কণ্ঠে বললে হোমস, জোরে পড়ো তো, চিঠিখানা, শোনা যাক!

জোরেই পড়লাম চিঠির বয়ান :-

মাই ডিয়ার মি. শার্লক হোমস—

ব্রিক্সটন রোড বহির্ভূত ৩নং লরিস্টন গার্ডেন্সে কাল রাতে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেছে। রাত দুটোর সময়ে বাড়ির মধ্যে আলো দেখে সন্দেহ হয় বীটের কনস্টেবলের–কেননা সে জানত বাড়িটা খালি–কেউ নেই। বাড়ির দরজা খোলা, আসবাবহীন সামনের ঘরে পড়ে ছিল একটা সুবেশ লোকের মৃতদেহ। পকেটের কার্ডে লেখা নামটা এনক জে ড্রেবার, ক্লীভল্যান্ড, ওহিয়ো, যুক্তরাষ্ট্র। ডাকাতি হয়নি–লোকটা মারা গেল কীভাবে সে-রকম কোনো চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না। ঘরে রক্তের দাগ আছে, কিন্তু লোকটার গায়ে ক্ষত নেই। ও-বাড়িতে সে এল কী করে ভেবে পাচ্ছি না পুরো ব্যাপারটা একটা প্রহেলিকা। বারোটার আগে মনে হয় যদি বাড়িটায় আসেন, আমাকে দেখতে পাবেন। আপনি না-আসা পর্যন্ত জিনিসপত্র কিছুই নাড়াচাড়া করা হবে না। আসতে যদি পারেন বিশদ বিবরণ আমার মুখেই শুনবেন খন–আপনার মতামত পেলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব।

আপনার বিশ্বস্ত টোবিয়াস গ্রেগসন।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট ডিটেকটিভ এই গ্রেগসন, বললে বন্ধুবর : রদ্দিমালের মধ্যে এই দুই জনই যা আছে লেসট্রেড আর গ্রেগসন। দু-জনেই চটপটে, উৎসাহী কিন্তু গতানুগতিক খুব খারাপ লাগে। রেষারেষিও আছে দু-জনের মধ্যে। কাজে দড় হলে কী হবে–কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না–আড়ালে পিণ্ডি চটকায়। এ-কেসে দু-জনে মাথা ঢোকালে বেশ রগড় হবে কিন্তু।

শান্ত মন্তব্য শুনে অবাক না-হয়ে পারলাম না। একটু জোরেই বললাম, কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না। যাব আমি? ছ্যাকড়াগাড়ি ডেকে আনব?

আদৌ যাব কিনা সেটাই ভাবছি। মাঝে মাঝে আমি এই জুতোর চামড়ার মতোই হদ্দ কুঁড়ে–কিন্তু সময় বিশেষে ভীষণ প্রাণবন্ত।

আরে ভাই এইরকম একটা সুযোগের কথাই তো একটু আগে বলছিলে।

ভায়া ওয়াটসন, এতে আমার কী লাভ বলতে পার? ধর রহস্যের সমাধান করলাম। গ্রেগসন লেসেট্রড কোম্পানি পুরো কৃতিত্বটাই পকেটে পুরবে। বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজনটা কী?

কিন্তু ও যে তোমার সাহায্য ভিক্ষা করছে!

তা করছে। কারণ ও জানে, এ-ব্যাপারে আমি ওর গুরু। নিজেও তা স্বীকার করে। কিন্তু প্রকাশ্যে নয়। জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলবে–তবুও তৃতীয় ব্যক্তির সামনে আমাকে ওর চাইতে বড়ো আসন দেবে না। তাহলেও চলো দেখে আসা যাক। নিজের কৌতূহল মেটাতেই যাব। যদি কিছু না-পাওয়া যায়, হাসিঠাট্টা করে আসা যাবেখন। এসো।

ঝটপট ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে চটপট পা বাড়াল হোমস উৎসাহ শেষ পর্যন্ত ঔদাসীন্যকে ঘাড়ধাক্কা দিতে পেরেছে।

টুপি নাও তোমার। বললে আমাকে। আমাকে আসতে বলছ?

হাত খালি থাকলে আসতেও পার। এক মিনিট পরে দু-জনেই একটা দু-চাকার ঘোড়ার গাড়ি চেপে ঝড়ের মতো ধেয়ে চললাম ব্রিক্সটন রোড অভিমুখে।

মেঘাচ্ছন্ন, কুয়াশা-মলিন প্রভাত; বাড়িগুলোর মাথায় বুঝি পিঙ্গলবর্ণ ঘোমটা ঝুলছে—বহু নীচের কাদারঙের রাস্তার প্রতিফলন যেন। ফুর্তিতে উচ্ছল আমার বন্ধুটি পরমোৎসাহে আমাকে বিভিন্ন বেহালার তফাত বোঝাচ্ছে। ক্রেমোনা বেহালার গুণাগুণ ব্যাখ্যার পর আমাতি আর স্ট্রাডিফেরিয়াসের তফাতটা বোঝানোর সময়ে আমি আর গুম হয়ে বসে থাকতে পারলাম না।

বললাম, তুমি তো দেখছি যে-কাজে চলেছ, তা নিয়ে একেবারেই ভাবছ না।

ভাববার মতো উপাদান হাতে না-আসা পর্যন্ত ভাবা উচিত নয়। সাক্ষ্যপ্রমাণ না-নিয়ে ভাবতে বসলেই বিরাট ভুল করে বসবে সিদ্ধান্ত পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যাবে।

উপাদান পেতে আর দেরি নেই, আঙুল তুলে বললাম আমি, এই হল ব্রিক্সটন রোড, আর ওই সেই বাড়ি।

ঠিক ধরেছ। ড্রাইভার, থামো! থামো! বাড়ি থেকে শ-খানেক গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল হোমস হেঁটে গেল বাকি রাস্তাটা।

৩নং লরিস্টন গার্ডেন্সের বাড়িটা দেখলেই কেন জানি না গা ছম ছম করে ওঠে। একটা অভিশপ্ত ছাপ যেন বাড়িটার সর্বত্র। রাস্তা থেকে একটু তফাতে মোট চারখানা বাড়ি। দুটিতে লোকজন আছে–দুটি শূন্য। ৩নং বাড়িটা এই শেষ দুটির একটি। তিন সারি নিরানন্দ জানলা যেন বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে–ঝাঁপসা কাচে ছানি পড়ার মতো হেথায়-সেথায় দুলছে বাড়িভাড়া পাওয়া যায় নোটিশ। রাস্তা আর বাড়ির মাঝে আগাছা বোঝাই একটা বাগান। বাগানের রাস্তা হলদেটে রঙের কঁকর আর কাদায় ছাওয়া। গত রাতের বৃষ্টিতে পুরো তল্লাটটাই অত্যন্ত কাদা প্যাঁচপেচে। তিন ফুট উঁচু ইটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা বাগান। পাঁচিলের ওপরে কাঠের রেলিং। একজন পুলিশ কনস্টেবল একদল নিষ্কর্মা লোক পরিবৃত অবস্থায় এই পাঁচিলে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। ভবঘুরের দল পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে চেষ্টা করছে কী কাণ্ড চলেছে বাড়ির ভেতরে।

ভেবেছিলাম একটুও দেরি না-করে হন হন করে বাড়ি ঢুকে রহস্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত হবে শার্লক হোমস। কিন্তু সে-রকম লক্ষণ দেখলাম না। উদ্দীপনাহীনভাবে পায়চারি করতে লাগল ফুটপাথে, শূন্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করল আকাশ, জমি, উলটোদিকের বাড়ি আর কাঠের রেলিংয়ের দিকে। আমার মনে হল স্রেফ ভণ্ডামি লোক দেখানো ভান! পর্যবেক্ষণ সমাপ্ত হলে এগোল রাস্তার কিনারায় ঘাসের পটি বরাবর চোখ রইল কিন্তু রাস্তার ওপর। থামল দু-বার, একবার হাসল, সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল। কর্দমাক্ত পথে পায়ের চিহ্ন অনেক। পুলিশ যাতায়াত করেছে বলেই অত পায়ের ছাপ পড়েছে। অত ছাপের মধ্যে থেকে হোমস কী করে যে আসল জিনিসটি খুঁজে পাবে ভেবে পেলাম না। তবে ওর প্রখর ইন্দ্রিয়ের অসাধারণ ক্ষমতা এবং চক্ষের পলকে অনুধাবন করবার শক্তির যে-নমুনা একটু আগে পেয়েছি তাতে মনে হয় আমার চোখে যা অদৃশ্য, তার অনেক কিছুই দৃশ্যমান হয়েছে ওর চোখে।

দোরগোড়ায় মুখোমুখি হলাম এক দীর্ঘকায়, সাদামুখো পুরুষের সঙ্গে, হাতে একটা নোট বই, চুলগুলো শণের মতো। হোমসকে দেখেই তিরবেগে দৌড়ে এসে দু-হাতে ওর হাত জড়িয়ে ধরে বলল গদগদ কণ্ঠে, অসীম দয়া আপনার! সব যেমন তেমনি রেখে দিয়েছি আপনার জন্যে একদম হাত দিইনি।

ওইটে ছাড়া। বাগানের রাস্তার দিকে আঙুল তুলে বলল হোমস। একপাল মোষ গেলেও রাস্তার অবস্থা ওর চাইতে খারাপ হত কিনা সন্দেহ। তার আগে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত খাড়া করে নিয়েছ?

জবাবটা এড়িয়ে গেল ডিটেকটিভ গ্রেগসন! বললে, ভেতরের ঝামেলা নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলাম বলে এদিকের ব্যাপারটা লেসট্রেডকে দেখতে দিয়েছি। ও এখানেই রয়েছে।

আমার দিকে চেয়ে ব্যঙ্গভরে ভুরু তুলল হোমস। বললে, তোমার আর লেসট্রেডের মতো দু-দুজন বাঘা গোয়েন্দা হাজির থাকার পর তৃতীয় ব্যক্তি আর কী পাবে বল। রিক্ত হস্তে ফিরতে হবে।

খুশি হল গ্রেগসন। দু-হাত ঘষে বললে, যা করবার সবই করেছি। তবে কী জানেন, কেসটা অদ্ভুত। আপনি আবার এইসব কেসই পছন্দ করেন।

এসেছ কীভাবে? ঘোড়ার গাড়িতে নিশ্চয়ই নয়? জিজ্ঞেস করল শার্লক হোমস।

আজ্ঞে না।

লেসট্রেডও নিশ্চয় গাড়িতে আসেনি?

আজ্ঞে না।

চলো তাহলে ঘরের ভেতরে যাওয়া যাক, বাড়ির ভেতরে পা বাড়াল হোমস। খাপছাড়া মন্তব্য নিয়ে আর একটি কথাও বলল না। হতভম্ব মুখে পেছন পেছন এল গ্রেগসন।

নগ্ন তক্তা লাগানো, ধূলিধূসরিত একটা ছোটো করিডর গিয়ে শেষ হয়েছে রান্নাঘর আর অফিস ঘরে। করিডরের বাঁ-দিকে আর ডান দিকে দুটো দরজা। একটা নিশ্চয় বন্ধ অনেক হপ্তা ধরে। আর একটা দরজা খাবার ঘরের। রহস্যজনক ব্যাপারটা রেখে গেছে এই ঘরেই। হোমস আমার আগে ঢুকল ঘরে, পেছনে আমি। মৃত্যুর সান্নিধ্যে হৃদঘাত মন্থর হয়ে আসে আমার এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

ঘরটা চৌকোনা, বেশ বড়ো। আরও বড়ো মনে হচ্ছে ফার্নিচার না-থাকায়। লাল শিখার মতো সমুজ্জ্বল সস্তা রুচির কাগজে মোড়া দেওয়াল, মাঝে মাঝে ছাতলার দাগ, কোথাও কোথাও বেশ খানিকটা ছিঁড়ে ঝুলছে, তলায় বেরিয়ে পড়েছে হলদে পলেস্তরা। দরজার উলটোদিকে একটা বাহারি ফায়ার প্লেস, নকল সাদা মর্মর দিয়ে চারদিক বাঁধানো। এরই এক কোণে এটা লাল গালার মোমবাতির তলদেশ। একটিমাত্র জানালা এত নোংরা যে আলো আসছে অতি ক্ষীণ আর অনিশ্চিতভাবে; ম্যাড়মেড়ে ধূসরতায় আবৃত করে রেখেছে ঘরের প্রতিটি বস্তু পুরু ধুলো জমে থাকার ফলে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে ধূসরতা।

এত খুঁটিনাটি লক্ষ করেছিলাম পরে। আমার সমস্ত সত্তা যেন তখন হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল মেঝের তক্তার ওপর শায়িত নিস্পন্দ দেহটির ওপর। চোখ খোলা, কিন্তু দৃষ্টি নেই সে-চোখে। ফ্যালফ্যাল শূন্য চোখে চেয়ে আছে বিবর্ণ কড়িকাঠের দিকে। বয়স চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ, মধ্যমাকৃতি, চওড়া কঁধ, কুঁচকানো ছোটো কালো চুল, খাটো মোটা শক্ত দাড়ি। পরনে ভারী কাপড়ের ফ্রক কোট আর ওয়েস্ট কোট, ট্রাউজার্স হালকা রঙের, কলার আর কাফ বেশ পরিচ্ছন্ন এবং পরিপাটি। পরিষ্কারভাবে বুরুশ করা টপ হ্যাটটা বসানো রয়েছে দেহের পাশে মেঝের ওপর। হাত মুষ্টিবদ্ধ, বাহু দু-পাশে ছড়ানো,

মৃত্যু যেন বড়োই যন্ত্রণাদায়ক হয়েছে। আড়ষ্ট মুখে পরিস্ফুট এমন একটা ভয়াবহ বিভীষিকা এবং সেইসঙ্গে একটা বিজাতীয় ঘৃণা যার সংমিশ্রণ কোনো মানুষের মুখে কখনো আমি দেখিনি! এই উৎকট আর ভয়ংকর মুখ-বিকৃতির সঙ্গে নীচু কপাল, থ্যাবড়া নাক আর ঠেলে-বেরিয়ে-আসা চোয়াল যুক্ত হওয়ায় মৃতব্যক্তিকে একটা অদ্ভুত নরবানরের মতো দেখতে হয়েছে। মৃত্যুকালীন যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় পড়ে থাকার দরুন আরও প্রকট হয়েছে নরবানর আকৃতি। মৃত্যুকে অনেক রূপে, অনেক চেহারায় আমি দেখেছি। কিন্তু সেদিন খাস লন্ডন শহরের অন্যতম মূল ধমনীর ওপর নির্মিত ছায়াচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে যে-মৃত্যু দেখলাম, তার চাইতে ভয়াবহ আর কিছু দেখিনি?

দোরগোড়ায় বেজির মতো চটপটে ক্ষীণ বপু নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল লেসট্রেড–অভ্যর্থনা জানাল আমাদের দুজনকেই।

বললে, কেসটা সাড়া ফেলবে, স্যার। জীবনে এ-রকম দৃশ্য দেখিনি। জানেন তো, সহজে বুক কাঁপে না আমার।

গ্রেগসন বললে, সূত্র-টুত্র কিছু পাওয়া গেল?

একেবারেই না যেন সুরে সুরে মেলাল লেসট্রেড।

মড়াটার কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে বসল শার্লক হোমস, খুঁটিয়ে দেখল থেকে মাথা পর্যন্ত। তারপর চারিপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসংখ্য রক্তের দাগের দিকে আঙুল তুলে

বলল, দেহে চোট লাগেনি বলছ ঠিক তো? একেবারে ঠিক! একই সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে দুই ডিটেকটিভ।

তাহলে এ-রক্ত দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির খুব সম্ভব হত্যাকারীর আদৌ যদি সত্যি হয়ে থাকে। ১৮৩৪ সালে ইট্রেক্টে ভ্যান জ্যানসেনের মৃত্যুর ব্যাপারটা মনে পড়ে যাচ্ছে। গ্রেগসন কেসটা মনে আছে!

আজ্ঞে না।

পড়ে নিয়ো–পড়া উচিত। সংসারের নতুন কিছু হচ্ছে না–সব হয়ে গিয়েছে।

কথার সঙ্গেসঙ্গে আঙুল চলছে হোমসের। তৎপর, দ্রুত, চঞ্চল আঙুল এত তাড়াতাড়ি টিপে দেখছে, বোতাম খুলছে, বুলিয়ে অনুভব করছে যে চোখে না-দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এত তাড়াতাড়ি অথচ এত নিপুণভাবে যে পরীক্ষা করা যায়, আগে জানতাম না। দুই চোখে কিন্তু সেই দিগন্ত বিস্তৃত স্বপ্নিল চাউনি—আগে যা বলেছি। সবশেষে মড়ার ঠোঁট এঁকে তাকাল পেটেন্ট চামড়ার জুতোর শুকতলায়।

বললে, লাশ নাড়ানো হয়নি তো?

আমাদের পরীক্ষার জন্যে যেটুকু নাড়ানো দরকার, তার বেশি নয়।

মর্গে চালান করতে পার। আর কিছু জানার নেই।

চারজন লোক স্ট্রেচার নিয়ে গ্রেগসনের হুকুমের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। হাঁকডাক শুনেই ঢুকল ভেতরে, আগন্তুককে নিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। লাশ তোলবার সময়ে কিন্তু একটা আংটি টং করে মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে যেতেই লাফিয়ে গিয়ে ছোঁ মেরে তুলে নিল লেসট্রেড। চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

পরক্ষণেই বললে গলার শির তুলে, মেয়েছেলেও ছিল এখানে। এ-আংটি বিয়ের আংটি। কনের আঙুলে থাকে।

বলতে বলতে হাতের তেলোয় আংটি বাড়িয়ে ধরেছিল লেসট্রেড। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম আমরা সবাই। না, কোনো সন্দেহই নেই, সোনার এই ছোটো চক্রটি একদা এক বিয়ের কনের আঙুলেই শোভা পেয়েছিল।

কেস দেখছি আরও জটিল হল, বললে গ্রেগসন। এমনিতেই জটের ঠেলায় চোখে অন্ধকার দেখছিলাম, জুটল নতুন উৎসর্গ।

তাই নাকি? আংটি তাহলে জট বাড়িয়ে দিচ্ছে? মন্তব্য করল শার্লক হোমস। হাঁ করে আংটির দিকে চেয়ে থাকলে নতুন কিছুই জানা যাবে না। লকেটে কী পেয়েছ বল।

এইখানেই সব আছে, সিঁড়ির নীচের ধাপে স্তুপীকৃত কয়েকটি বস্তুর দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললে গ্রেগসন। লন্ডনের ব্যারড কোম্পানির তৈরি একটা সোনার ঘড়ি–নম্বর ৯৭১৬৩। খুব ভারী আর নিরেট সোনার অ্যালবার্ট চেন। গুপ্ত সমিতির চিহ্ন আঁকা সোনার আংটি। সোনার পিন–মাথাটা বুলডগের, চোখ দুটো চুনির। রাশিয়ান চামড়ার কার্ড-কেস, কার্ড লেখা এনক জে ড্রেবার অফ ক্লিভল্যান্ড। জামাকাপড়েও লেখা ই জে ডি। মানিব্যাগ নেই। কিন্তু আছে সতেরো পাউন্ড তেরো শিলিংয়ের মতো খুচরো টাকা পয়সা। বোকাসিওর ডেক্যামেরন বইখানার পকেট সংস্করণ, পুস্তনিতে লেখা জোসেফ স্ট্যানজারসনের নাম। দুটো চিঠি–একটা লেখা হয়েছে ই জে ড্রেবারকে, আর একটা জোসেফ স্ট্যানজারসনকে।

কোন ঠিকানায়?

স্ট্যান্ডের আমেরিকান এক্সচেঞ্জের ঠিকানায় –এসে নিয়ে যাওয়ার চিঠি। দুটোই এসেছে গুইয়ন স্টিমশিপ কোম্পানি থেকে, লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়ার খবর। বেচারা নিউইয়র্কে ফেরার তোড়জোড় করছিল।

স্ট্যানজারসন সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছ?

সঙ্গেসঙ্গে ব্যবস্থা করেছি, বললে গ্রেগসন।সবক-টা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছি। লোক পাঠিয়েছি আমেরিকান এক্সচেঞ্জে, ফেরেনি এখনও।

ক্লিভল্যান্ডে খবর দিয়েছ?

টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি আজ সকালে।

কী জানতে চেয়েছ?

ঘটনার বিবরণ দিয়ে লিখেছি এই সম্পর্কে কিছু খবর পেলে খুশি হব।

যে-পয়েন্টটা প্রামাণিক আর চূড়ান্ত বলে মনে হয়েছে, সে-সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ জানতে চাওনি?

স্ট্যানজারসন সম্বন্ধে খবরাখবর চেয়েছি।

আর কিছু নয়? পুরো কেসটাই ঝুলছে যে-পয়েন্টে, সেটা সম্বন্ধে কিছুই জানতে চাওনি? আর একটা টেলিগ্রাম পাঠাবে?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গ্রেগসন বললে, যা বলবার সবই বলেছি।

খুক খুক করে হেসে উঠল শার্লক হোমস। কী একটা কথা বলতে যাচ্ছে, এমন সময়ে বাইরের ঘর থেকে লেসট্রেড এসে পৌঁছোল এ-ঘরে। আত্মম্ভরিতা আর আত্মতৃপ্তি ঝরে পড়ছে দু-হাত ঘষার মধ্যে।

বললে, মি. গ্রেগসন, এইমাত্র একটা দারুণ গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছি। ভাগ্যিস দেওয়ালটা তন্নতন্ন করে দেখছিলাম, নইলে তো এ-জিনিস সবারই চোখ এড়িয়ে যেত।

সতীর্থকে একহাত নিতে পেরে সে কী ফুর্তি খর্বকায় মানুষটার। ঝিকমিক করছে দুই চোখ, চাপা উত্তেজনা বুড়বুড়ি কাটছে চোখে-মুখে।

হুড়মুড় করে ভেতরে এসে বললে সোল্লাসে, আসুন এদিকে দাঁড়ান এখানে। বিকট মড়া সরানোর ফলে ঘরে আবহাওয়ার উন্নতি ঘটেছিল। বুটের চামড়ায় দেশলাই ঘষে জ্বলন্ত কাঠিটা দেওয়ালের ওপর দিকে তুলে ধরল লেসট্রেড।

বললে বিজয়োল্লাসে, দেখুন!

আগেই বলেছি, ছেড়া কাগজের লম্বা ফালি ঝুলছিল সবক-টা দেওয়ালেই। এই জায়গাটায় চৌকোনো হলদে পলেস্তারা বেরিয়ে পড়েছে বেশ খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে যাওয়ায়। হলুদ প্লাস্টারের ওপর রক্ত-লাল অক্ষরে লেখা একটি মাত্র শব্দ–

RACHE

বলুন কী বুঝলেন? সাড়ম্বরে হস্তসঞ্চালনে লেখাঁটি দেখিয়ে বললে লেসট্রেড, যেন জবর খেলা দেখাচ্ছে সার্কাসের বাজিকর। লেখাটা ছিল সবচেয়ে অন্ধকার কোণে–তাই কারো

চোখে পড়েনি–দেখবার কথাও মনে হয়নি। হত্যাকারী এ-লেখা লিখেছে নিজের রক্ত দিয়ে। দেখছেন না অক্ষর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে দেওয়াল বেয়ে। আত্মহত্যার সম্ভাবনা তাহলে নাকচ হয়ে গেল। শব্দটা ঘরের এ-কোণে কেন লেখা হয়েছিল বলুন তো? আমি বলছি। মোমবাতিটা দেখছেন? ওটা জ্বালানো হলে কিন্তু ওই কোণেই আলো পড়বে সবচেয়ে বেশি–অন্ধকার আর থাকবে না।

আবিষ্কারের ফলে লাভটা কী হল? প্রতিপক্ষকে পথে বসিয়ে দেওয়ার স্বরে বলল গ্রেগসন।

লাভ? আরে মশাই, RACHEL নামটা লিখতে গিয়ে বাধা পাওয়ায় RACHE পর্যন্ত লেখা হয়েছে। RACHEL নামটা কিন্তু মেয়ের। কেসটা যখন গুটিয়ে আনা হবে, তখন দেখবেন র্যাচেল নামে একটা মেয়ে এর মধ্যে আছে। হাসা খুব সোজা মি. শার্লক হোমস। আপনি খুবই চালাক আর স্মার্ট মানছি, কিন্তু জানবেন কাঙালের কথা বাসি হলেও খাটে।

খর্বকায় ডিটেকটিভের মেজাজ খিচড়ে গিয়েছিল হোমসের অকস্মাৎ অট্টহাসির জন্যে। হাসি থামিয়ে এখন বললে, কিছু মনে কোরো না। পুরো কৃতিত্ব তোমারই কেউ দেখে ফেলার আগেই তুমি দেখেছ এমন একটা নাম যে কাল রাতের রহস্য নাটিকার অন্যতম ব্যক্তির স্বহস্তে লেখা। ঘরটা এখনও পর্যন্ত দেখিনি। এবার যদি অনুমতি কর তাহলে দেখা যাক।

বলতে বলতে হোমস পকেট থেকে ঝাঁ করে টেনে বার করল একটা মাপবার ফিতে আর একটা মস্ত গোলাকার আতশকাচ। এই দুটি সরঞ্জামসহ শুরু হল তার নিঃশব্দ সঞ্চরণ ঘরের সর্বত্র। কখনো হেঁট হল, কখনো হাঁটু গেড়ে বসল, কখনো মুখ থুবড়ে সটান মেঝের ওপর নুয়ে পড়ল। মনোযোগী হয়ে রইল নিজের কাজে আমাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছে মনে হল। কেননা, বিবিধ মন্তব্যর ধারাবর্ষণ চালিয়ে গেল একনাগাড়ে আপন মনে চাপা গলায়। কখনো হর্ষে ফেটে পড়ল, কখনো বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল, কখনো বিষাদে গুঙিয়ে উঠল, কখনো ফুর্তিতে শিস দিয়ে উঠল–বিপুল উৎসাহ আর প্রত্যাশা যেন মূর্ত হল ছোটো ছোটো চিৎকারের মধ্যে। ঠিক যেন খানদানি রক্তের উপর্যুক্ত ট্রেনিং পাওয়া একটা ফক্স হাউন্ড–ঝোঁপের মধ্যে দিয়ে ছুটোছুটি করছে, সাগ্রহে গরগর করছে, হারিয়ে যাওয়া গন্ধটা নাকে না-আসা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। কুড়ি মিনিট কি তারও বেশি সময় এইভাবে চুলচেরা মাপজোক করে গেল হোমস হাতের ফিতে দিয়ে কী যে ছাই মাপল আমি বুঝলাম

কেননা আমার চোখে তা সম্পূর্ণ অদৃশ্যই রয়ে গেল। আমি না-দেখলেও ও কিন্তু অনেক। দাগ দেখেছিল এবং একটা দাগ থেকে আর একটা দাগ কতটা দূরে ফিতে দিয়ে মাপছিল শুধু মেঝেতে নয়–দেওয়ালেও ফিতে ফেলে কী যে মাপল, বিন্দুবিসর্গ বুঝলাম না। একবার মেঝে থেকে ধূসর ধুলোর ছোট্ট একটা স্তূপ সযত্নে তুলে নিয়ে খামে পুরে রাখল পকেটে। সবশেষে আতশকাচ দিয়ে দেওয়ালের লিখন নিরীক্ষণ করল অসীম যত্নে কিছুই যেন বাদ না-যায় এমনিভাবে তন্নতন্ন করে সবক-টা হরফ ম্যাগনিফাইং গ্লাসের মধ্যে দিয়ে বিবর্ধিত আকারে দেখার পর মনে হল যেন বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে! ফিতে আর কাচ রাখল পকেটে।

হেসে বলল, কথায় বলে প্রতিভাকে অনেক কষ্ট করতে হয়, নইলে কেষ্ট মেলে না। সংজ্ঞাটা যাচ্ছেতাই হলেও ডিটেকটিভ লাইনে খাটে।

শখের গোয়েন্দার চাতুর্যপূর্ণ গতিবিধি, বিলক্ষণ কৌতূহল এবং কিছুটা অবজ্ঞাসহ লক্ষ করছিল গ্রেগসন আর লেসট্রেড। একটা ব্যাপার স্পষ্ট বুঝলাম। শার্লক হোমসের ছোটোখাটো তৎপরতাও যেন নির্দিষ্ট এবং বাস্তব লক্ষ্য অভিমুখী এরা দুইজনেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি।

তাই দুজনেই শুধালো একই সাথে, বলুন কী বুঝলেন।

বন্ধুবর বললে, আমি যদি তোমাদের সাহায্য করে ফেলি, তাহলে তোমাদের আর বাহবা নেওয়া হয় না। কাজ যা করছ তা চমৎকার, মাঝখান থেকে বাগড়া দিতে চাই না। প্রত্যেকটা শব্দের মধ্যে ধ্বনিত হল নিঃসীম বিদ্রপ। তদন্ত করছ কীরকম, সে-খবর যদি আমাকে জানানোর দরকার থাকে বলে মনে কর, তখন না হয় আমার সাধ্যমতো সাহায্য করা যাবেখন। আপাতত লাশ যে আবিষ্কার করেছে সেই কনস্টেবলটির সঙ্গে কথা বলতে চাই। নাম-ঠিকানা দেবে?

নোটবই বার করে নাম-ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে লেসট্রেড বললে, জন রান্স। এখন ডিউটি নেই। কেনিংটন পার্ক গেটে৭ ৪৬ নম্বর অডলি কোর্টে গেলেই পাবেন!

ঠিকানাটা লিখে নিল হোমস।

বলল, এসো ডাক্তার! জন রান্সকে খুঁজে বার করা যাক। দুই ডিটেকটিভের দিকে ফিরে, তোমাদের শুধু একটা ব্যাপার বলে যেতে চাই–শোনা থাকলে তদন্তের সুবিধা হবে! এটা খুন–খুনি একজন পুরুষ। মাথায় ছ-ফুটেরও বেশি ঢ্যাঙা, পূর্ণ যুবক মাথায় যতখানি ঢ্যাঙা সে-অনুপাতে পা অনেক ছোটো, পুরু চৌকোনো-মুখ বুটজুতো পরে, ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায়। যে খুন হয়েছে তার সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এসেছিল এখানে। এক ঘোড়ায় টানা গাড়ি। গাড়িটায় চারটে চাকা। ঘোড়াটার সামনে পায়ের একটা নাল নতুন, বাকি তিনটে পুরোনো, খুব সম্ভব হত্যাকারীর মুখ উজ্জ্বল লালচে, রক্ত যেন ফেটে পড়ছে আর ডান হাতের আঙুলের নখ আশ্চর্য রকমের বড়ো! সামান্য কিছু পথনির্দেশ দিলাম, তোমাদের কাজে লাগবে।

অবিশ্বাসের হাসি হেসে পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে লেসট্রেড আর গ্রেগসন।

খুনই যদি হবে তো হয়েছে কী করে বলে যান? শুধোয় লেসট্রেড।

বিষে, অশিষ্টভাবে সংক্ষেপে জবাব দিয়ে পা বাড়ায় শার্লক হোমস। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আর একটা কথা, লেসট্রেড। র্যাচি একটা জার্মান শব্দ–মানে প্রতিশোধ। কাজেই খামোকা মিস র্যাচেলকে খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট কোরো না।

ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেল হোমস–পেছনে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী।

জন রান্স যা বললে

তিন নম্বর লরিস্টন গার্ডেন্স ছেড়ে বেরিয়ে এলাম বেলা একটার সময়। নিকটতম টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে একটা সুদীর্ঘ টেলিগ্রাম পাঠাল শার্লক হোমস। তারপর একটা গাড়ি ডেকে লেসট্রেড প্রদত্ত ঠিকানায় যেতে বললে গাভোয়ানকে।

যেতে যেতে বললে, সাক্ষ্যপ্রমাণ যত টাটকা পাওয়া যায়, ততই ভালো। এ-কেস নিয়ে আমার মনে আর ধোঁকা নেই। তাহলেও আরও খবর যদি পাওয়া যায়, নেওয়া দরকার।

আমি বললাম, হোমস তাজ্জব করলে আমাকে। যা বলে এলে, তা কি সব জেনেই বললে?

ভুল করার মতো কিছু থাকলে তো ভুল করব। অকুস্থলে পৌঁছেই সবার আগে যা যা দেখলাম তা একটা গাড়ির চাকার দাগ ফুটপাত ঘেঁষে চাকার দু-সারি দাগ পড়েছে। বৃষ্টি কাল রাতেই হয়েছে, তার আগের সাতদিনে হয়নি। কাজেই চাকার গভীর দাগটাও কাল রাতেই পড়েছে। ঘোড়ার খুরের ছাপও পড়েছে কাদায় তিনটে অস্পষ্ট, একটা খুব স্পষ্ট তার মানে নতুন নাল। গ্রেগসন বলেছে সকালের দিকে গাড়ি ছিল না বাড়ির সামনে। গাড়িটা কিন্তু এসেছিল বৃষ্টি আরম্ভ হওয়ার পর। সুতরাং ধরে নিলাম, ওই গাড়ি চেপেই গভীর রাতে দু-জনে এসেছিল বাড়িতে!

খুব সোজা তো! কিন্তু হত্যাকারী মাথায় কতখানি ঢ্যাঙা, তা বললে কী করে?

দশজনের মধ্যে ন-জনের ক্ষেত্রেই লম্বা লম্বা পা ফেলার মাপ থেকে বলে দেওয়া যায় মাথায় কতখানি ঢ্যাঙা। হিসেবটা সোজা, কিন্তু অঙ্ক দিয়ে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করতে চাই না। লোকটার পায়ের ছাপ দু-জায়গায় পেয়েছি বাইরের কাদায়, ভেতরের ধুলোয়। হিসেবটা যাচাই করার সুযোগও পেয়েছি। দেওয়ালের গায়ে লেখবার সময়ে মানুষমাত্রই চোখের সামনে লেখে–এক লেভেলে। মেঝে থেকে ছ-ফুট উঁচুতে হয়েছে লেখাটা। বাকিটা স্রেফ ছেলেখেলা।

লোকটার বয়স বললে কী করে?

যে-লোক অবলীলাক্রমে সাড়ে চার ফুট পদক্ষেপে হাঁটে, পূর্ণযৌবন কি তার মধ্যে টলমল করছে না? বাগানের রাস্তাটুকু ওইভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে এসেছে হত্যাকারী। ছোটো পদক্ষেপে হেঁটেছে পেটেন্টে চামড়ার বুট–সে-ছাপ ভেঙে দিয়েছে চৌকোনো-মুখ বুট। এর মধ্যে রহস্য নেই, ওয়াটসন। প্রবন্ধটায় পর্যবেক্ষণ আর সিদ্ধান্ত নেওয়ার যেসব নিয়মকানুন লিখেছি, তারই কিছু কিছু প্রয়োগ করেছি মামুলি জীবনে। বলো, আর কী কী বুঝতে পারনি?

আঙুলের নখ আর ত্রিচিনোপল্লী।

দেওয়ালের লেখাটা একজন পুরুষের আঙুলের রক্তে আঙুল ডুবিয়ে লিখেছে। আতশকাচের মধ্যে লক্ষ করলাম, লিখতে গিয়ে প্লাস্টারেও আঁচড় পড়েছে নখ কাটা থাকলে আঁচড় পড়ার কথা নয়। মেঝে থেকে খানিকটা ছাই কুড়িয়ে নিয়েছিলাম মনে আছে? কালচে স্তরে স্তরে সাজানো, একমাত্র ত্রিচিনোপল্লী চুরুটেই এমনি ছাই হয়। চুরুটের ছাই নিয়ে আমার বিশেষ পড়াশুনা আছে, এ-বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখেছি। বললে অহংকার শোনায়, কিন্তু যেকোনো চুরুট বা তামাকের যেকোনো ছাই দেখে আমি বলে দিতে পারি কোনটা কী ব্র্যান্ডের এবং তফাত কোথায়। লেসট্রেড আর গ্রেগসনের সঙ্গে দক্ষ ডিটেকটিভের তফাত ওইখানেই।

লালচে মুখ?

ওটা একটা আন্দাজি ব্যাপার। তবে আমার বিশ্বাস ভুল হবে না। এই পরিস্থিতিতে এর বেশি জিজ্ঞেস কোরো না।

কপালে হাত চালিয়ে বললাম, মাথা ঘুরছে আমার। যতই ভাবছি, ততই রহস্যজনক ঠেকছে। ফাঁকা বাড়িতে দু-জনে এল কী মতলবে। শুধু দু-জনেই যে এসেছিল, তার কী প্রমাণ? কোচোয়োন গেল কোথায়? একজন কি আর একজনকে বিষ খেতে বাধ্য করতে পারে? অত রক্ত এল কোত্থেকে? হত্যাকারী হত্যা করতে গেল কেন?

ডাকাতির চিহ্ন তো দেখা যায়নি। মেয়ের আংটি-বা এল কোত্থেকে। সবচেয়ে বড়ো রহস্য, সরে পড়ার আগে দ্বিতীয় ব্যক্তি জার্মান শব্দ রাচি লিখতে গেল কেন? কিছুই বুঝছি না, কোনোটার যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না।

সম্মতিসূচক হাসি হাসল বন্ধুবর।

বলল, ছোট্টর মধ্যে সবক-টা রহস্য গুছিয়ে বললে। অস্পষ্ট এখনও অনেক কিছুই কিন্তু মূল বিষয়গুলো সুস্পষ্ট আমার মনের মধ্যে। লেসট্রেড বেচারি যে-আবিষ্কার করে তুরুক নাচ নাচছে, ওটা আসলে পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার ব্যবস্থা পুলিশ যাতে ভুল পথে তদন্ত করে, সমাজবাদ আর গুপ্ত সমিতি নিয়ে ঘুরে মরে। ও-লেখা কোনো জার্মান লেখেনি। A অক্ষরটা জার্মান ছাঁদে লেখা–লক্ষ করেছ নিশ্চয়। কিন্তু খাঁটি জার্মান ল্যাটিন ছাঁদে লেখে। নিশ্চিন্ত মনে তাই বলতে পার, একজন আনাড়ি জার্মান ছাঁদ নকল করতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। স্রেফ ধোঁকা দিয়ে বিপথে চালনা করার প্রয়াস! ডাক্তার, এর বেশি আর তোমায় বলব না। জানো তো, জাদুকর হাত সাফাইয়ের কায়দা যদি বলেই দেয়, তাহলে আর বাহাদুরি পায় না। আমার কাজের পদ্ধতি যদি বেশি বলতে থাকি, তুমি আমাকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে ফেলবে।

কখনো না অমন কর্ম আমার দ্বারা আর সম্ভব হবে না। এ-পৃথিবীতে গোয়েন্দাগিরিকে পাকাপোক্ত বিজ্ঞানের আসনে তুমিই প্রথম বসালে।

কথাগুলো অন্তর থেকে বলেছিলাম। বন্ধুবর তা লক্ষ করে আনন্দে আরক্ত হয়ে উঠল। গোড়া থেকেই দেখছি, প্রশংসা শুনলে গলে যায় হোমস, সৌন্দর্যের প্রশংসায় মেয়েরা যেমন ডগমগ হয়–শার্লক হোমসও স্বকীয় শিল্পের প্রশংসায় বিচলিত হয় বিলক্ষণ।

তাই ফের বললে, তাহলে আর একটা কথা বলা যাক। পেটেন্ট চামড়ায় বুট আর চৌকোনা-মুখ বুট একই গাড়িতে এসেছে, বাগানের রাস্তা বেয়ে বন্ধুর মতো হাত ধরাধরি করে হেঁটেছে। বাড়ির মধ্যে ঢোকার পর পেটেন্ট চামড়া এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে কিন্তু চৌকোনা বুট ঘরময় পায়চারি করেছে। ঘরের ধুলোতেই সে-ছাপ রয়েছে। লোকটা একদণ্ডও থামেনি–ক্রমাগত এদিক-ওদিক করেছে, বকবক করেছে, একটু একটু করে নিজেকে তাতিয়ে খুনের প্রস্তুতি এনেছে। উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে পায়চারি করার সঙ্গেসঙ্গে বুঝলাম ক্রমশ বেশি লম্বা পা ফেলার ছাপ দেখে! শেষকালে ক্রোধ যখন চরমে পৌঁচেছে, খুন করেছে সঙ্গীকে। যা বললাম, তার কিছু জেনেছি, বাকিটা অনুমান করেছি। তদন্ত শুরু করার মতো ভালো বনেদ কিন্তু পেয়েছি। এবার চটপট কাজটা শেষ করা দরকার। কেননা, বিকেলে হ্যালির কনসার্টে যাব নরম্যান নেরুদার বাজনা শুনতে।

এ-কথা যখন হচ্ছে, গাড়ি তখন চলেছে বিবর্ণ নোংরা রাস্তা আর বিষণ্ণ নিরানন্দ অলিগলি দিয়ে। সবচেয়ে নোংরা আর নিরানন্দ গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি। মৃত্যু-রঙিন ইটের দেওয়ালে একটা ফাঁক দেখিয়ে কোচোয়ান বললে–অডলি কোর্ট। এখানেই পাবেন আমাকে। ঘুরে আসুন।

অডলি কোর্ট খুব একটা আকর্ষণীয় অঞ্চল নয়। সরু গলিপথের পর পাথর বাঁধানো একটা চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। সারি সারি হীনদর্শন বাড়ি। বিরং পোশাক পরা নোংরা চেহারার বাচ্চাদের মাঝ দিয়ে পৌঁছোলাম ৪৬ নম্বর বাড়ির সামনে। দরজায় তামার পাতে খোদাই করা রান্সের নাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কনস্টেবল মহোদয় এখন শয্যায়। খবর পাঠানোর পর আমাদের বসতে দেওয়া হল সামনের সংকীর্ণ বারান্দায়।

ঘুম থেকে তুলে আনার জন্যে মেজাজ সপ্তমে চড়িয়ে অচিরে এল জন রান্স।

বলল, আমি তো রিপোর্ট দিয়ে এসেছি অফিসে।

পকেট থেকে একটা আধগিনি বার করে চিন্তামগ্ন ভাবে নাচাতে নাচাতে হোমস বললে—আমরা বসেছিলাম তোমার নিজের মুখে ব্যাপারটা শুনতে।

সোনার ছোট্ট চাকতির দিকে চেয়ে থেকে কনস্টেবল বললে, সানন্দে বলব। বলুন কী জানতে চান।

যা-যা ঘটেছিল, বলো তোমার মতো করে।

ঘোড়ার চুল দিয়ে ঠাসা সোফায় বসল রান্স। কপাল কুঁচকে ভেবে নিলে যাতে একটা কথাও না বাদ যায়।

বলল, গোড়া থেকে বলছি। আমার ডিউটি রাত দশটা থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত। হোয়াইট হার্টের মদের আড্ডায় এগারোটা নাগাদ একটা মারপিট হয়েছিল–তারপর সব ঠান্ডা। একটার সময় শুরু হল বৃষ্টি। হল্যান্ড গ্রোভ বীটের কনস্টেবল হ্যারি মার্চারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে হেনরিয়েট্টা স্ট্রিটে গল্প করতে লাগলাম দু-জনে। একটু পরে, দুটো নাগাদ কি তারও একটু পরে, ঠিক করলাম ব্রিক্সটন রোডে সব ঠিকঠাক আছে কিনা টহল দিয়ে দেখে আসা যাক। দারুণ নোংরা আর ফাঁকা রাস্তা। দু-একটা গাড়ি পাশ দিয়ে গেল–তা ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দু-জনে ভাবছি এই সময়ে একটু জিন পেলে কি ভালোই না হত, এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাড়ির জানালায় আলোর আভা দেখলাম। লরিস্টন গার্ডেন্সের ওই দুটো বাড়িতে কেউ থাকে না আমি জানতাম। কারণ বাড়ির মালিক নর্দমা সাফ করে না–অথচ একজন ভাড়াটে টাইফয়েডে মারা গেছে সেখানে। তাই অবাক হলাম বাড়ির মধ্যে আলো দেখে। সন্দেহ হল নিশ্চয় ব্যাপার সুবিধের নয়। দরজার সামনে আসতেই—

থমকে দাঁড়ালে। ফিরে এলে বাগানের দরজায়। কেন বল তো? বাধা দিয়ে বললে হোমস।

ভীষণ চমকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল রান্স। বিষম বিস্ময়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল শার্লক হোমসের মুখপানে।

আরে সর্বনাশ! সত্যিই থমকে গিয়ে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু আপনি স্যার জানলেন কী করে? ভারি আশ্চর্য তো! ব্যাপারটা কী জানেন, দরজার সামনে পর্যন্ত গিয়ে বাড়ির

ভেতরটা এমন খাঁ খাঁ অবস্থায় নিস্তব্ধ দেখলাম যে মনে হল একা যাওয়াটা ঠিক হবে না–সঙ্গে কাউকে রাখি! ভূতের ভয় আমার নেই স্যার। কিন্তু হঠাৎ কেন জানি মনে হল, টাইফয়েডে যে-মরেছে হয়তো সে ফিরে এসেছে নর্দমায় মৃত্যুর কারণটা খুঁজতে। ভাবতেই গা ছমছম করে উঠল। ভাবলাম, ফিরে যাই। মার্চারের লণ্ঠন দেখলে ডেকে নিয়ে আসি। কিন্তু কাউকেই দেখলাম না। না মার্চার, না কেউ।

কেউ ছিল না রাস্তায়?

জ্যান্ত কেউ ছিল না–কুকুর পর্যন্ত নয়। তাই সাহসে বুক বেঁধে ফিরে এলাম। একটা দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকলাম। কোনো আওয়াজ না-পেয়ে গেলাম যে-ঘরে আলো জ্বলছিল। ম্যান্টল পিসে লাল মোমবাতি জ্বলতে দেখলাম, সেই আলোয় দেখলাম—

জানি কী দেখলে। ঘরময় কয়েকবার চরকিপাক দিয়ে লাশের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লে। তারপর উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খোলার চেষ্টা করলে

ভয়ার্ত মুখে ফের লাফিয়ে উঠে সন্দিগ্ধ চোখে শার্লক হোমসের দিকে চেয়ে রান্স বললে, কোথায় লুকিয়ে ছিলেন বলুন তো? আপনি তো দেখছি আমার চাইতে বেশি জানেন?

হাসতে হাসতে নিজের-নাম-লেখা কার্ডটা টেবিলের উপর দিয়ে কনস্টেবলের দিকে ছুঁড়ে দিল হোমস, দেখো হে, খুনের দায়ে শেষে আমাকেই গ্রেপ্তার করে বোসো না। আমি

শিকারীর কুকুর, নেকড়ে নই। মি. গ্রেগসন আর মি. লেসট্রেডকে জিজ্ঞেস করলেই শুনবে খন। আপাতত থেমো না। বলে যাও তারপর কী হল।

রান্স ফের আসন গ্রহণ করল বটে, কিন্তু রহস্যমদিরতা গেল না চোখ-মুখ থেকে। বললে, গেটে এসে বাঁশি বাজালাম। শুনে দৌড়ে এল মার্চার এবং আরও দু-জন।

তখনও কি ফাঁকা ছিল না রাস্তা?

আচ্ছা আমি বলতে কেউ ছিল না।

তার মানে? কী বলতে চাও?

দাঁত বার করে হাসল কনস্টেবল, জীবনে অনেক মাতাল দেখেছি স্যার। কিন্তু কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়া মাতাল দেখিনি। বেরিয়ে এসে দেখি রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে টলছে আর গলা ছেড়ে কলাম্বাইন্স নিউফ্যানগলড ব্যানার জাতীয় একটা গান গাইছে একটা লোক। টলছে ভীষণভাবে পড়ে যায়নি এই যথেষ্ট।

কী ধরনের লোক? শুধোল শার্লক হোমস।

অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় খিটখিটে স্বরে বললে জন রান্স, অসাধারণ মাতাল। হাতে কাজ– থাকলে নির্ঘাত ফাটকে পুরতাম।

মুখটা দেখেছিলে? পোশাক? অসহিষ্ণু স্বর শার্লক হোমসের।

দেখেছিলাম বলেই তো মনে হচ্ছে? আমি আর মার্চার ধরাধরি করে খাড়া করে দিয়েছিলাম বলেই দেখেছিলাম। তালঢ্যাঙা, লালচে মুখ, মুখের নীচের দিক মাফলার দিয়ে–

ওতেই হবে, সজোরে বললে হোমস। কী করলে তাকে নিয়ে?

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে পুলিশম্যান, তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময় ছিল না। নিজের বাড়িতেই হয়তো গেছে।

জামাকাপড় কী পরেছিল?

ব্রাউন ওভারকোট।

হাতে চাবুক ছিল?

চাবুক–না।

নিশ্চয় রেখে এসেছিল, স্বগতোক্তি করে হোমস। এরপর আর তাকে দেখোনি? গাড়িও চোখে পড়েনি?

না।

এই নাও তোমার আধগিনি, উঠে দাঁড়িয়ে টুপি তুলে নিয়ে বললে হোমস।রান্স, জীবনে তুমি প্রমোশন পাবে না। তোমার ওই মাথাটা গয়নার মতো সাজিয়ে রাখা ছাড়া আর কোনো কাজে লাগবে না। কাল রাতেই তুমি সার্জেন্টের স্ট্রাইপ পেয়ে যেতে। যাকে বগলদাবা করে তুলেছিলে, এ-রহস্যের সূত্র তারই হাতে। তাকেই আমরা এখন খুঁজছি। তর্ক করে লাভ নেই! চলে এসো ডাক্তার!

একইসঙ্গে দুই বন্ধু রওনা হলাম গাড়ি অভিমুখে। অবিশ্বাসভরা চোখে চেয়ে বিষম অস্বস্তির মধ্যে জন রান্স দাঁড়িয়ে রইল পেছনে।

বাড়ির দিকে ছুটে চলল গাড়ি। ভেতরে বসে তিক্ত কণ্ঠে হোমস বললে, বেটা গাধা কোথাকার! একটার পর একটা ভুল করে গেছে! ভাবতে পার এ-রকম একটা অতুলনীয় সুযোগ হাতের মুঠোর মধ্যে আসা সত্ত্বেও ছেড়ে দিতে পারে কেউ?

আমি যে বন্ধু এখনও যে-তিমিরে সেই তিমিরেই রয়েছি। এই রহস্যের দ্বিতীয় ব্যক্তির বর্ণনা তুমি একটু আগে দিয়েছ তার সঙ্গে এই লোকটার চেহারা হুবহু মিলে যায় মানছি।

কিন্তু মাথায় ঢুকছে না বাড়ি ছেড়ে চম্পট দেওয়ার পর আবার কেন ফিরে এল সে। ক্রিমিন্যালদের স্বভাব কিন্তু তা নয়।

আংটি... আংটি... আংটির জন্যেই ফিরে আসতে হয়েছে তাকে। আর কোনো পন্থাতেই যদি তার টিকি ধরতে না-পারি–এই আংটির টোপ ফেলেই তাকে ছিপে গাঁথব। ডাক্তার, বাজি ফেলে বলছি, ওকে আমি কবজায় আনবই। কিন্তু ধন্যবাদটা তোমারই প্রাপ্য। কেন জান? তুমি না ঠেলেঠুলে পাঠালে এ-কেসে আমি মাথা গলাতাম না–বঞ্চিত হতাম আমার গবেষক জীবনের শ্রেষ্ঠতম গবেষণা থেকে উজ্জ্বল লাল রঙের খুনের সূত্র–আমাদের কর্তব্য তা আলাদা করে বার করা, রহস্য গ্রন্থিকে সরল করা এবং হাটের মধ্যে প্রহেলিকার হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া। আপাতত চলো লাঞ্চ খাই, তারপর শুনব নরম্যান নেরুদার বাজনা। আহা, খাসা হাত ভদ্রমহিলার কায়দাকানুনেরও তুলনা নেই। শোপার সেই সুরটা এত চমৎকার বাজান ট্রা-লা লা-লেরা-লিরা-লে।

গাড়ির কোণে হেলান দিয়ে ভরত পক্ষীর মতো মনের আনন্দে গান গেয়ে চলল শখের রহস্যসন্ধানী–অ্যামেচার ব্লাড হাউন্ড–আর আমি তন্ময় হয়ে রইলাম মানবমনের বহুমুখী রহস্য নিয়ে।

বিজ্ঞাপনের জবাবে সাক্ষাৎপ্রার্থী

আমার শরীর দুর্বল। সকালের ধকলে তাই কাত হয়ে পড়লাম। বিকেলে আর বেরোতে পারলাম না। হোমস একাই গেল কনসার্ট শুনতে। আমি সোফায় শুয়ে ঘণ্টা দুয়েক ঘুমোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথাই। বিবিধ ঘটনা প্রবাহে মস্তিষ্ক এতই উত্তপ্ত এবং এতই উত্তেজিত। যে অস্থির হয়ে পড়লাম, অদ্ভুততম কল্পনা আর অনুমানের উৎপাতে। ঘুমোনোর চেষ্টায় প্রতিবার চোখ বোজবার সঙ্গেসঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল নিহত ব্যক্তির বিকৃত বেবুন-সদৃশ মুখাবয়ব। জ্বলে পুড়ে গেলাম স্মৃতির এই জঘন্য অত্যাচারে। এহেন মুখের মালিককে যে-ব্যক্তি ধরাধাম থেকে সরিয়ে দিয়েছে তাকে মনে মনে ধন্যবাদ না-দিয়ে পারলাম না। অতীব করাল চেহারার পাপ যদি মানুষের চেহারায় কখনো বিমূর্ত হয়ে থাকে, তবে তা ক্লিভল্যান্ড নিবাসী এনক জে ড্রেবারের মুখ। তা সত্ত্বেও পাপীকে সাজা দিতেই হবে। কেননা, লম্পটকেও লাম্পট্যের শাস্তি দিলে না আইন কখনো শাস্তিদাতাকে ক্ষমা করে না।

ব্যাপারটা নিয়ে যতই মনে মনে তোলপাড় করতে লাগলাম, বন্ধুবরের অনুমিতিটা ততই অসাধারণ মনে হতে লাগল আমার কাছে! ও বলেছিল, লোকটাকে বিষ দিয়ে খুন করা হয়েছে। মনে পড়ল কীভাবে নিহত ব্যক্তির ঠোঁট এঁকেছিল হোমস। বিষ প্রয়োগে হত্যার ধারণাটা ওর মগজে প্রবেশ করেছে নিশ্চয় তখনই। বিষক্রিয়ায় হত্যাই যদি না হয় তবে তো হত্যাটা হল কীভাবে? গলা টেপার চিহ্ন নেই–অস্ত্রাঘাতের ক্ষতও নেই। মেঝের ওপরে রক্তের ওই পুকুরটা তাহলে কার? ধস্তাধস্তির চিহ্ন দেখা যায়নি–নিহত ব্যক্তির

কাছেও এমন কোনো অস্ত্র পাওয়া যায়নি যার আঘাতে হত্যাকারীর দেহ থেকে রক্তপাত ঘটতে পারে। বেশ বুঝলাম, এতগুলো ধাঁধার সমাধান না-হওয়া পর্যন্ত ঘুমোনো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে হোমসও পারবে না ঘুমোতে। ওর প্রশান্ত আত্মবিশ্বাসী আচরণ থেকেই স্পষ্ট বুঝেছি রহস্যাবলির চাবিকাঠি এর মধ্যে ওর পকেটে পৌঁছে গিয়েছে–মনে মনে ধাঁধার একটা সমাধানও ছকে নিয়েছে কিন্তু সে-সমাধান যে আসলে কী, কিছুতেই তা ভেবে উঠতে পারলাম না।

হোমস বাড়ি ফিরল কিন্তু অনেক দেরিতে এত দেরি নিশ্চয় শুধু কনসার্ট শোনার জন্যে হয়নি। ডিনার টেবিলে খাবার সাজানো হয়ে যাওয়ার পর আবির্ভাব ঘটল মূর্তিমানের!

চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, অপূর্ব! সংগীত সম্বন্ধে ডারউইন কী বলেছিলেন মনে আছে? বলেছিলেন, মানুষের মধ্যে কথা বলার শক্তি আসার অনেক আগেই এসেছিল গান গাওয়ার শক্তি। সেই জন্যেই বোধ হয় সংগীত এত সূক্ষ্মভাবে নাড়া দেয় আমাদের। বিশ্ব যখন শৈশবাবস্থায় তখনকার কুয়াশা ছাওয়া বহু শতাব্দীর স্মৃতি এখনও রয়ে গিয়েছে প্রত্যেকের সত্তায়।

ধারণাটা খুব ব্যাপক, মন্তব্য করলাম আমি।

প্রকৃতিকে বোঝাতে গেলে ধারণাটাও প্রকৃতির মতোই ব্যাপক হওয়া দরকার। কী ব্যাপার বল তো? তোমাকে তো খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না? ব্রিক্সটন রোড রহস্যে বিচলিত হয়েছ দেখছি।

সত্যিই হয়েছি, বললাম আমি। আফগান অভিজ্ঞতার পর আমার আরও একটু শক্ত হওয়া উচিত ছিল। কেইওয়ান্দে কচুকাটা হতে দেখেছি কমরেডদের নার্ভ কাঁপেনি একটুও।

বুঝি। এ-ব্যাপারে এমন একটা রহস্য আছে যা কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবেই। কল্পনা যেখানে নেই, বিভীষিকাও সেখানে নেই। সান্ধ্য দৈনিক দেখেছ?

না।

ঘটনাটার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ছেপেছে। শুধু একটা কথা বলেনি। মৃতদেহ তোলবার সময়ে মেয়েলোকের বিয়ের আংটি গড়িয়ে পড়ার ঘটনাটার কোনো উল্লেখ নেই। না-করে ভালোই করেছে।

কেন?

এই বিজ্ঞাপনটা দেখলেই বুঝবে। আজ সকালেই ওই কাণ্ড দেখে আসার পর সবক-টা খবরের কাগজে পাঠিয়েছিলাম বিজ্ঞাপনটা!

কাগজটা ছুঁড়ে আমার দিকে এগিয়ে দিল হোমস। নির্দিষ্ট জায়গাটিতে চোখ বুলোলাম।হারানো প্রাপ্তি স্তম্ভের পয়লা বিজ্ঞাপন।হোয়াইট হার্ট মদ্যশালা আর হল্যান্ড গ্রোভের মাঝের রাস্তায় ব্রিক্সটন রোডে আজ সকালে একটা সোনার সাদাসিদে আংটি

পাওয়া গেছে। আজ সন্ধ্যায় ২২১বি, বেকার স্ট্রিটস্থ ডা. ওয়াটসনের সঙ্গে আটটা থেকে ন-টার মধ্যে সাক্ষাৎ করুন।

তোমার নাম ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইছি, বললে হোমস। আমার নাম ব্যবহার করলে মুখগুলো চিনতে পারত–সব ভণ্ডুল করে দিত।

তা ঠিক। কিন্তু ধর যদি কেউ আসে। আংটি তো নেই আমার কাছে।

আছে বই কী, একটা আংটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল হোমস-এতেই হবে। প্রায় ওইরকমই দেখতে।

বিজ্ঞাপনে কে সাড়া দেবে বলে মনে হয় তোমার?

ব্রাউন কোট পরা লালমুখো আমাদের সেই বন্ধুটি–যার জুতোর ডগা চৌকোনা–পায়ের আঙুলও তাই। নিজে না-এলেও স্যাঙাত কাউকে পাঠাবেই।

আসাটা কিন্তু খুবই বিপজ্জনক তার পক্ষে সে-খেয়াল কি তার নেই বলছ?

একেবারেই নেই! এ-মামলায় আমি যা ভেবেছি তা যদি ঠিক হয় এবং ঠিক বলেই আমার বিশ্বাস–তাহলে সোনার আংটি ফেরত পাওয়ার জন্যে যেকোনো ঝুঁকি নিতে সে প্রস্তুত। আমার ধারণা মতো, ড্রেবারের মৃতদেহের পাশে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে আংটিটা

পড়ে যায়–কিন্তু সে জানত না। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর যখন সে জানল, দৌড়ে এল আংটি উদ্ধার করতে কিন্তু পারল না পুলিশ দেখে। দোষটা তারই। জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে যাওয়ার দরুনই আলো দেখে পুলিশ এসে গিয়েছে। গেটের কাছে অত রাতে তাকে দেখলে পাছে পুলিশের সন্দেহ হয় তাই মদ্যপের অভিনয় করতে হল তৎক্ষণাৎ। এবার তার জায়গায় নিজেকে কল্পনা করো। পুরো ব্যাপারটা গোড়া থেকে নতুন করে ভাবতে গিয়ে এমন ভাবা স্বাভাবিক নয় কি যে আংটিটা হয়তো রাস্তায় কোথায় ফেলেছে... বাড়ির মধ্যে নেই! সেক্ষেত্রে তার কী করা উচিত? হারিয়ে যাওয়া জিনিস যদি কেউ খুঁজে পেয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়, এই আশায় দুরু দুরু বুকে সান্ধ্যদৈনিক দেখা। এই বিজ্ঞাপনটাও সে দেখবে। আনন্দে আটখানা হবে। ফাঁদে পা দিতে চলেছে এ-ধারণা মাথায় আসবে কেন? খুনের সঙ্গে আংটির যে সম্পর্ক থাকতে পারে, এমন কোনো যুক্তি তার মাথায় এলে তো। তাই আসবে। আসতেই হবে। এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পড়বে। দেখা করবে তো?

তারপর?

আমার ওপর ছেড়ে দিয়ো ! তোমার হাতিয়ার আছে?

পুরোনো মিলিটারি রিভলবার আর কয়েকটা কার্তুজ আছে।

সাফ করে নিয়ে গুলি ভরে রাখ। লোকটা কিন্তু মরিয়া, যদিও ওকে আমি আচমকা কবজায় আনব, তাহলেও খারাপ পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত থাকা ভালো।

শোবার ঘরে গিয়ে ওর কথামতো রিভলবারে গুলি ভরে নিলাম। ফিরে এসে দেখি খাবার টেবিল সাফ হয়ে গিয়েছে। হোমস ওর প্রিয়তম বেহালা নিয়ে ঘষামাজা করতে বসেছে।

আমি ঢুকতেই বললে, ষড়যন্ত্র গভীর হচ্ছে। আমার আমেরিকান টেলিগ্রামের জবাব পেলাম এইমাত্র। এ-মামলা সম্বন্ধে আমার ধারণাই সত্যি।

কী ধারণা? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি আমি। নতুন তার লাগালে বেহালার বাজনাটা আরও খুলবে। পিস্তলটা পকেটে রাখ। লোকটা এলে সাধারণভাবে কথাবার্তা বলবে। বাকি যা করবার আমি করব। কটমট করে চেয়ে ভয় পাইয়ে দিয়ো না।

এখনই তো আটটা বাজে, ঘড়ি দেখে বললাম আমি।

হ্যাঁ। মিনিট কয়েকের মধ্যেই সে এল বলে। দরজাটা একটু খোলো—ওতেই হবে! চাবিটা ভেতরে রাখো। ধন্যবাদ। এই বইটা গতকাল হঠাৎ পেয়ে গেলাম স্টলে। অদ্ভুত বই। ভীষণ পুরোনো। ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে পোল্যান্ডের লাজে ল্যাটিন ভাষায় ছাপা। বাদামি মলাটে বাঁধানো খুদে এই বই যখন ছাপার হরফে প্রথম বেরোয়, চার্লসের মাথা তখনও খাড়া ঘাড়ের ওপর।

কে ছেপেছে?

ফিলিপ দ্য ক্রয়। পুস্তনিতে ফিকে কালি দিয়ে একটা নামও দেখতে পাচ্ছি–উইলিয়াম হোয়াইট। লোকটা কে বুঝতে পারছি না। সপ্তদশ শতাব্দীর অনধিকার চর্চাকারী কোনো আইনবিদ হতে পারে। লেখার মধ্যে আইনের প্যাঁচ আছে। এসে গেছে আমাদের লোক।

কথা শেষ না হতে হতেই ঢং ঢং করে বেশ জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল একতলায়। নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল শার্লক হোমস, চেয়ারটা সরিয়ে নিয়ে গেল দরজার দিকে। হলঘরে পরিচারিকার পায়ের আওয়াজ পেলাম, খট করে ল্যাচ খোলার শব্দও ভেসে এল।

ড. ওয়াটসন এখানে থাকেন? সুস্পষ্ট কিন্তু কর্কশ কণ্ঠে উচ্চারিত হল প্রশ্নটা। পরিচারিকার উত্তর শুনতে পেলাম না। দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কে যেন মচ মচ শব্দে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। অনিশ্চিত পদক্ষেপ–পা ঘষটে ঘষটে চলার মতো! কান খাড়া করে শুনতে শুনতে অবাক হল হোমস বিস্ময়ের ঢেউ বয়ে গেল চোখ-মুখের ওপর দিয়ে। গলিপথ বেয়ে পদশব্দ আস্তে আস্তে এসে পৌঁছল দরজার সামনে আলতোভাবে কে যেন টোকা মারল দরজায়।

ভেতরে আসুন বললাম চেঁচিয়ে।

ঘরে ঢুকল একজন অতি বৃদ্ধা, জরাজীর্ণ, বলিরেখা কুঞ্চিত ভদ্রমহিলা–যার প্রতীক্ষায় বসে থাকা সেই ভয়ংকর দুর্দান্ত ব্যক্তিটি নয়। ঘরের জোরালো আলোয় যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেছে বুড়ির এমনিভাবে সৌজন্য বর্ষণটুকু কোনোমতে সেরে নিয়ে ঘোলাটে চোখে পিট পিট করে চেয়ে রইল আমাদের পানে এবং নার্ভাস, কঁপা আঙুলে হাতড়াতে লাগল

নিজের পকেট। বন্ধুবরের পানে চেয়ে দেখি মুখখানা ভীষণ নিরাশ করে তুলেছে। অগত্যা নিজের মুখের ভাব ঠিকঠাক রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত হলাম আমি।

পকেট থেকে সান্ধ্য দৈনিক টেনে বার করে বিজ্ঞাপনটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বুড়ি বলল, এসেছি এই বিজ্ঞাপনটা পড়ে, আর এক দফা সৌজন্য বর্ষণ করে–ব্রিক্সটন রোডে একটা সোনার বিয়ের আংটি পাওয়া গেছে। আংটিটা আমার মেয়ে স্যালির। বারো মাস আগে বিয়ে হয়েছিল ইউনিয়ন জাহাজের ভাণ্ডারীর সঙ্গে। জামাই আমার এমনিতে ভালো, কিন্তু পেটে মদ পড়লে অন্য মানুষ। কাল রাতে স্যালি সার্কাস দেখতে গিয়ে–

এই আংটিটা? বললাম আমি।

জয় ভগবান! ঘুমিয়ে বাঁচবে আজকে স্যালি! হা! এই সেই আংটি!

আপনার ঠিকানা? পেনসিল তুলে নিয়ে বললাম।

তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রিটে, হাউন্ডসডিচ। এখান থেকে বেশ দূরে।

আচমকা তীক্ষ্ণ গলায় বলল শার্লক হোমস, সার্কাস আর হাউন্ডসডিচের মাঝামাঝি রাস্তা তো ব্রিক্সটন রোড নয়।

ঘুরে দাঁড়িয়ে রক্ত বলয় ঘেরা ছোটো চোখে হোমসকে নিরীক্ষণ করে বুড়ি বললে, ইনি আমার ঠিকানা জানতে চেয়েছিলেন। স্যালি থাকে তিন নম্বর মেফিল্ড প্লেস, পেকহ্যাম!

আপনার নাম?

সইয়ার। স্যালির নাম ডেনিস–টম ডেনিসকে বিয়ে করার পর। ছেলে ভালো, চটপটে পরিচ্ছন্ন–যতক্ষণ সমুদ্রে থাকে ততক্ষণ! ওরকম ভাণ্ডারী সব জাহাজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ডাঙায় এলেই মেয়েদের আর মদের পাল্লায় পড়ে–

হোমসের ইঙ্গিত লক্ষ করলাম। আংটি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—নিন আপনার জিনিস। মিসেস সইয়ার, এ-আংটি আপনার মেয়েরই। আসল লোকের হাতে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি হলাম।

বিড়বিড় করে বিস্তর আশীর্বাদ আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আংটিটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখল বুড়ি–পা ঘষে ঘষে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে বেরোতে-না-বেরোতেই তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস ছুটে গেল নিজের ঘরে। গলাবন্ধ আর আলস্টার চাপিয়ে ফিরে এল সেকেন্ড কয়েক পরেই। দ্রুতকণ্ঠে বললে, পিছু নিতে হবে দেখছি। বুড়ি নিশ্চয়ই খুনির স্যাঙাত–পেছনে পেছনে গেলেই খুনির দেখা পাব। আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো। বুড়ি সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর হলঘরের দরজা বন্ধ হতে-না-হতেই হুড়মুড় করে নেমে গেল শার্লক হোমস। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, বুড়ি পা টেনে টেনে চলেছে ওদিকের ফুটপাথ দিয়ে! পেছনে কিছু দূরে আঠার মতো লেগে

আমার বন্ধুটি। মনে মনেই বললাম–হয় ওর থিয়োরি আগাগোড়া ভুল, আর না হয় রহস্যের নাভিকেন্দ্রে যাওয়ার অভিযান এইবার হল শুরু। আমাকে প্রতীক্ষা করতে না-বললেও চলত। নৈশ-অ্যাডভেঞ্চারের পরিণাম না-শোনা পর্যন্ত ঘুম আমার পক্ষে অসম্ভব।

ও বেরোল ন-টা নাগাদ! কখন ফিরবে জানি না। তা সত্ত্বেও গ্যাঁট হয়ে বসে পাইপ টানতে লাগলাম আর হেনরি মার্জারের বই পড়তে লাগলাম। দশটা বাজল, পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝলাম শুতে গেল পরিচারিকা। এগারোটায় শুনলাম বাড়িউলির ভারিক্কি পদধ্বনি–আমার দরজার সামনে দিয়ে গেল শোবার ঘরের দিকে। বারোটা বাজতে যখন কয়েক মিনিট বাকি, ল্যাচে চাবি ঘোরানোর তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল উপরে। ঘরে ঢুকতেই হোমসের মুখ দেখে বুঝলাম সফল হয়নি অভিযান। নৈরাশ্য আর কৌতুকের মধ্যে লড়াই লেগেছে মুখখানাকে পুরোপুরি দখলে রাখার। হঠাৎ শেষকালে জিতে গেল কৌতুক। বিষম মজায় প্রাণ খুলে অট্টহেসে ফেটে পড়ল শার্লক হোমস।

চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে বললে, মরে গেলেও এ-খবর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের কানে তুলতে পারব না। ওদের এত টিটকিরি দিয়েছি যে এই একটা সুযোগ পেলে সুদে-আসলে উশুল করে নেবে। আমি হাসছি, কেননা আমি জানি শেষ পর্যন্ত আমি জিতবই।

কী হয়েছে বলবে তো।

বলতে গেলে আমার কেচ্ছাই আমাকে বলতে হয়। তাতে অবশ্য পরোয়া করি না। ওই যে-প্রাণীটা বিদেয় হল এ-ঘর থেকে, কিছুদূর যাওয়ার পর এমন খোঁড়াতে লাগল যে

বেশ বুঝলাম পায়ের পাতায় ঘা হয়ে গিয়েছে। শেষকালে আর হাঁটতে না-পেরে হাতছানি দিয়ে দাঁড় করালে একটা চার চাকার চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি। আমি ঠিক পাশটিতে গিয়ে কানখাড়া করলাম কোচোয়ানকে কোথায় যেতে বলে শোনবার জন্যে। অবশ্য তার দরকার ছিল না। ঠিকানাটা এত জোরে বলল বুড়ি যে ওপাশের ফুটপাথে থেকেও নিশ্চয় স্পষ্ট শোনা গিয়েছিল।

তেরো নম্বর ডানকান স্ট্রিট, হাউন্ডসডিচে চলো। বুড়ি তাহলে সত্যিই বলেছে। ভেতরে উঠে বসতেই আমি জায়গা করে নিলাম পেছনে। এটাও একটা আর্ট–সব ডিটেকটিভের রপ্ত হওয়া উচিত। গন্তব্যস্থানে না-পৌছানো পর্যন্ত একবারও লাগামটান দিল না কোচোয়ান, ঊর্ধ্বশ্বাসে গেল ডানকান স্ট্রিটে। তেরো নম্বরের দরজা আসার আগেই টুপ করে নেমে পড়লাম গাড়ির পেছন থেকে, তারপর গজেন্দ্র গমনে হেঁটে গেলাম পথটা। লাফিয়ে নেমে দরজা খুলে ধরল কোচোয়ান–দূর থেকেই দেখলাম ভেতরের লোকের বাইরে আসার প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। কিন্তু কেউ এল না বাইরে। কাছাকাছি গিয়ে দেখলাম পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে শূন্য গাড়ির আসন, আর এমন সব বাছা বাছা খিস্তি ছাড়ছে যা জীবনে আমি শুনিনি। প্যাসেঞ্জারের টিকি দেখা যাচ্ছে না–সে যে গাড়ির মধ্যে এসেছে এমন কোনো চিহ্নও নেই। ভাড়া পেতে এখন বেশ কিছুদিন সবুর করতে হবে কোচোয়ান বেচারাকে। তেরো নম্বর বাড়ির মধ্যে খোঁজ নিয়ে জানলাম সইয়ার বা ডেনিস বলে কেউ কস্মিনকালেও সেখানে থাকেনি। বাড়ির মালিক একজন মান্যগণ্য ব্যবসাদার—ঘরের দেওয়ালে কাগজ সাঁটার কারবার আছে।

সবিস্ময়ে বললাম, বলছ কী! ওইরকম একটা থুথুরে শণের বুড়ি চলন্ত গাড়ি থেকে। লাফিয়ে নেমে গেল অথচ তোমার বা কোচোয়ানের চোখে পড়ল না?

থুথুরে বুড়ির কথায় আগুন! খ্যাক করে উঠল শার্লক হোমস।বুড়ি বলে যাকে ভেবেছি আসলে সে বুড়িই নয়–জোয়ান ছোঁড়া এবং পাক্কা অভিনেতা। ছদ্মবেশখানা কী নিয়েছিল বল? জবাব নেই। ও দেখেছে আমি পিছু নিয়েছি, তাই সটকান দিয়েছে এইভাবে। এতেই বোঝা গেল লোকটাকে যতখানি নিঃসঙ্গ ভেবেছিলাম ততখানি সে নয়। তার সঙ্গীসাথী আছে–এমন সঙ্গী যারা দরকার মতো বিরাট ঝুঁকিও নিতে পারে তার জন্যে। ডাক্তার, বড্ড কাহিল দেখাচ্ছে তোমাকে। যাও, এবার শুয়ে পড়ো।

সত্যিই বড্ড ক্লান্তি বোধ করছিলাম। তাই ওর হুকুম শিরোধার্য করলাম। সধূম আগুনের সামনে বন্ধুবরকে বসিয়ে রেখে গেলাম শোবার ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমের ঘোরেও শুনলাম বেহালার তারে ছড়ি টেনে চলেছে হোমস। নীচু গ্রামে বাজাচ্ছে বড়ো বিষণ্ণ সুর। বুঝলাম অদ্ভুত সমস্যায় এখনও নিমগ্ন রয়েছে শার্লক হোমস।

কেরামতি দেখাল টোবিয়াস গ্রেগসন

পরের দিন সকালে সবক-টা খবরের কাগজে ফলাও করে ছাপা হল ব্রিক্সটন মিস্ত্রির চাঞ্চল্যকর সংবাদ। লম্বা লম্বা বিবরণ ছাপল প্রত্যেকেই কেউ কেউ সম্পাদকীয় পর্যন্ত লিখে ফেলল। কতকগুলো তথ্য আমার কাছেও নতুন। কেসটা সম্পর্কে অসংখ্য পেপার কাটিং এখনও রয়েছে। আমার স্ক্র্যাপবুকে। কয়েকটার সংক্ষিপ্তসার নীচে তুলে দিলাম :-

ডেলি টেলিগ্রাফ-এর মন্তব্য অনুসারে অপরাধ ইতিহাসে কদাচিৎ এরকম বৈচিত্র্যময় ট্রাজেডি দেখা গিয়েছে। দেওয়ালের পৈশাচিক লিখন, মোটিভের অভাব এবং নিহত ব্যক্তির জার্মান নাম কিন্তু রাজনৈতিক আশ্রিত এবং বিপ্লবীদের দিকেই আঙুল দেখাচ্ছে। সমাজবাদীদের বহু শাখা আছে আমেরিকার। নিহত ব্যক্তি নিশ্চয় অলিখিত কোনো আইন ভঙ্গ করেছিল। তাই ইংল্যান্ড পর্যন্ত ধাওয়া করা হয়েছে তাকে। শেষ পর্যন্ত বেশ উজ্জ্বলভাবে ডারউইনের থিয়োরি, ম্যালথাসের সূত্র, র্যাটক্লিফ রাজপথ নরহত্যার উল্লেখ করে সরকারের পিণ্ডি চটকে এবং ইংল্যান্ডে পরদেশিদের ওপর সজাগ রাখার উপদেশ দিয়ে শেষ করা হয়েছে প্রবন্ধ।

স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকায় একহাত নেওয়া হয়েছে উদার শাসনব্যবস্থাকে –এর ফলেই নাকি বেড়ে ওঠে আইন ভঙ্গকারিরা। জনগণের অনিশ্চিত মানসিকতা এবং কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে এরা মাথাচাড়া দেয়। নিহত ব্যক্তি একজন মার্কিন ভদ্রলোক! লন্ডন শহরে বাস করছিলেন বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে। ম্যাডাম চারপেনটিয়ারের একটা

বোর্ডিং হাউস আছে ক্যামবারওয়েলের টর্কটেরেস অঞ্চলে। নিহত ব্যক্তি উঠেছিলেন সেখানে। পর্যটন সাথী ছিল তাঁরই সেক্রেটারি জোসেফ স্ট্র্যানজারসন। চৌঠা মঙ্গলবার বাড়িউলির কাছে বিদায় নিয়ে দু-জনেই অস্টিন স্টেশন অভিমুখে রওনা হয়েছিলেন লিভারপুল এক্সপ্রেস ধরার অভিপ্রায়ে। পরে দু-জনকেই প্ল্যাটফর্মে একত্রে দেখা গিয়েছে। এরপর থেকে মি. ড্রেবারের লাশ পাওয়া পর্যন্ত আর কোনো খবর পাওয়া যায়নি। লাশ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু ব্রিক্সটল রোডের একটি শূন্যভবনে ইউস্টন স্টেশন থেকে বহু মাইল দূরে! কীভাবে মি. ড্রেবার সেখানে পৌঁছেছিলেন এবং কীভাবেই-বা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। এখনও তা রহস্যাবৃত। স্ট্যানজারসনের গতিবিধিও রহস্যাবৃত কোনো খবর নেই। আনন্দের কথা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড এবং মি. গ্রেগসন দু-জনেই এই কেসের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। সুতরাং নিশ্চিতভাবে আশা করা যায়, স্বনামধন্য এই দুই অফিসারের তৎপরতায় অচিরেই রহস্যগ্রন্থি উন্মোচিত হবে এবং দুষ্কৃতকারী ধরা পড়বে।

ডেলি নিউজ পত্রিকার পর্যবেক্ষণ অনুসারে অপরাধটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। উদারনীতির অত্যাচারে মহাদেশীয় সরকার তাড়িত বহু ব্যক্তি আশ্রয় নিয়েছে আমাদের ভূমিতে–স্বৈরতন্ত্র আর ঘৃণার স্মৃতি ভুলতে পারলে আদর্শ নাগরিক হতে পারত এরা প্রত্যেকেই। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার অধীন এরা এতটুকু লঙ্ঘন ঘটলেই শাস্তি মৃত্যু। সেক্রেটারি স্টারজারসনকে যেভাবেই হোক খুঁজে বার করা দরকার। নিহত ব্যক্তির বিশেষ কী কী অভ্যেস ছিল, সে-সম্বন্ধেও তদন্ত করা প্রয়োজন। বোর্ডিং হাউসের ঠিকানা পাওয়ার কাজ অনেক এগিয়েছে। বিরাট এই আবিষ্কারের সমস্ত কৃতিত্বই প্রাপ্য অবশ্য

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. গ্রেগসনের। তাঁর উদ্যম আর অধ্যবসায়ের ফলেই নিহত ব্যক্তির সাময়িক আস্তানার হদিশ মিলেছে।

প্রাতরাশ খেতে খেতে আমি আর শার্লক হোমস একত্রে পড়লাম খবরগুলো। দেখলাম, সন্দেশ বৈচিত্র্যে বেশ মজা পেয়েছে বন্ধুবর।

বলিনি তোমাকে, যাই ঘটুক না কেন লেসট্রেড আর গ্রেগসন বাহবা লুটে বেরিয়ে যাবে।

কেস কী দাঁড়ায় দ্যাখ, কে কত বাহবা ললাটে তখন দেখা যাবে।

তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। কিন্তু তাতেও কিছু হবে না। খুনি ধরা পড়লেও ওরা বাহবা পাবে, না-পড়লেও পাবে। ধরা যদি পড়ে সবাই বলবে ওদের খাটনির জন্যেই তা হয়েছে। না-পড়লে বলবে, খাটনি সত্ত্বেও খুনি পগার পার হয়েছে। টস করার মতো আর কি! এ-পিঠ পড়লে আমার লাভ, ও-পিঠ পড়লে তোমার হার।

এ আবার কী! চমকে উঠলাম। হল ঘরে আর সিঁড়ির ওপর অকস্মাৎ অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। সেইসঙ্গে তারস্বরে বিরক্তি ঘোষণা করছেন বাড়িউলি।

ডিটেকটিভ পুলিশ ফোর্সের বেকার স্ট্রিট বাহিনী আসছে, গম্ভীরভাবে বললে বন্ধুবর এবং কথার মাঝেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল আধ ডজন নোংরা রাস্তার ছেলে। জীবনে এ-

রকম ছেড়া জামাকাপড় পরা আর এত নোংরা মায়ে-খেদানো বাপে-তাড়াননা রাস্তার ছেলে দেখিনি।

অ্যাটেনশন!তীক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠল হোমস! তৎক্ষণাৎ ছ-টা কাদামাখা স্কাউড্রেল সারি দিয়ে সামরিক কায়দায় দাঁড়িয়ে গেল আধ ডজন ভাঙাচোরা কদর্য পাথরের মূর্তির মতো। এরপর থেকে শুধু উইগিন্সকে পাঠাবি খবর দিতে বাদবাকি দাঁড়াবি রাস্তায়। উইগিন্স, পেয়েছিস?

একটা উঞ্চু বলে, আজ্ঞে না, পেলাম না।

জানতাম পাবি না। না-পাওয়া পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যা। এই নে তোদের রোজ। প্রত্যেকের হাতে একটা শিলিং দিয়ে যা এবার বেরো। এর পরের বার আরও ভালো খবর নিয়ে তবে আসবি।

হাত নাড়তেই একপাল ধেড়ে ইঁদুরের মতো খসখস মড়মড় দুমদাম শব্দে ছোঁড়াগুলো নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে। পরমুহূর্তে রাস্তা থেকে ভেসে এল সরু তীক্ষ্ণ কচি গলার চিৎকার।

হোমস বললে, এক ডজন পুলিশ চর যা না-পারে, এদের একজন তা পারে। পুলিশি চেহারা দেখলেই মুখে চাবি দেয় প্রত্যেকেই। কিন্তু এরা সর্বত্র যায়, সবার কথা শোনে। ছুঁচের মতো তীক্ষ্ণ প্রত্যেকেই শুধু দরকার সংগঠনের।

ব্রিক্সটন কেসে এদের লাগিয়েছ বুঝি?

হ্যাঁ। একটা ব্যাপার আমি যাচাই করতে চাই। একটু যা সময় লাগবে। আরে! আরে! এবার কিন্তু আরও খবর আসছে–সেইসঙ্গে লাঞ্ছনা। গ্রেগসন আসছে। রাস্তা দিয়ে হাঁটছে দেখ! স্বর্গসুখ যেন উথলে উঠছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত! নিশ্চয় আমাদের কাছেই আসছে। ঠিক ধরেছি! ওই দ্যাখো দাঁড়িয়ে গেল। ওই আসছে!

বিষম শব্দে বেজে উঠল দরজার ঘণ্টা। পরমুহূর্তেই এক এক লাফে তিনটে করে ধাপ টপকে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে উল্কার মতো বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল সাদা চুলা ডিটেকটিভ।

উষ্ণ অভ্যর্থনার ধার দিয়ে গেল না হোমস। গ্রেগসন কিন্তু ওর নিঃসাড় হাতখানা খপ করে তুলে নিয়ে করমর্দন করতে করতে বললে সোল্লাসে, মাই ডিয়ার মি. হোমস, অভিনন্দন জানান! পুরো ব্যাপারটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার করে এনেছি!

হোমসের ভাবসমৃদ্ধ মুখের ওপর দিয়ে চকিতে ভেসে গেল উদবেগের কালোছায়া।

বললে, ঠিক লাইন ধরে ফেলেছ?

ঠিক লাইন কী বলছেন। আরে মশাই, খুনিকে হাজতে পুরে এসেছি। নাম কী তার?

আর্থার চারপেনটিয়ার। নৌবাহিনীর সাব লেফটেন্যান্ট। মোটা মোটা দু-হাত ঘষে আর বুক ফুলিয়ে আত্মম্ভরিতায় যেন ফেটে পড়ল গ্রেগসন!

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল শার্লক হোমস।

বোসো। নাও, এই চুরুটটা টেনে দেখতে পার। কীভাবে জাল গুটিয়ে আনলে শুনতে ইচ্ছে যাচ্ছে। হুইস্কি আর জল চলবে?

আপত্তি নেই। দিন দুয়েক প্রচণ্ড ধকল গেছে–হুইস্কির দরকার হয়েছে বই কী। শারীরিক নয়, মানসিক। টানাপোড়েনে শেষ করে এসেছি। মি. শার্লক হোমস, এ-খাটনি যে কী জিনিস তা আপনি বুঝবেন, কেননা আপনি আমি দু-জনেই মগজ খাঁটিয়ে খাচ্ছি!

খুব বেশি সম্মান দিয়ে ফেললে আমাকে, গম্ভীরভাবে বললে হোমস।এখন বল অতীব সন্তোষজনক এহেন সমাপ্তি সম্ভব হল কীভাবে।

আর্মচেয়ারে বসল ডিটেকটিভ। নির্লিপ্তভাবে সুখটান দিল চুরুটে। আচমকা বিষম কৌতুকে যেন ফেটে পড়ল সশব্দে উরুতে চপেটাঘাত করে।

বললে সোল্লাসে, মজাটা কি জানেন? হাঁদারাম লেসট্রেড নিজেকে বড্ড বেশি চালাকচতুর মনে করে তো, তাই গোড়া থেকেই ছুটেছে ভুল পথে। ও দৌড়েছে সেক্রেটারি

স্ট্যানজারসনকে পাকড়াও করতে, অথচ সে-লোকটা মায়ের পেটের বাচ্চার মতোই অমলিন, নির্দোষ। এতক্ষণে বোধ হয় তাকে গ্রেপ্তারও করে ফেলেছে।

দৃশ্যটা কল্পনা করে এত সুড়সুড়ি অনুভব করলে গ্রেগসন যে বিষম না-খাওয়া পর্যন্ত হেসেই চলল আপন মনে।

তোমার সূত্র পেলে কীভাবে বল?

বলব, বলব, আপনাকে সব বলব। ডক্টর ওয়াটসন, এসব কথা কিন্তু এই ক-জনের মধ্যেই সীমিত থাকবে। প্রথম সমস্যাটা হল গিয়ে আমেরিকান ভদ্রলোকের পূর্ব পরিচয়। আর কেউ হলে বিজ্ঞাপনের জবাব আসার অপেক্ষায় অথবা স্বেচ্ছায় কারো বলে যাওয়ার পথ চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকত। কিন্তু টোবিয়াস গ্রেগসনের কাজের ধারাই আলাদা। মনে আছে মৃত ব্যক্তির পাশে একটা টুপি পড়ে ছিল?

হা মনে আছে। ১২৯ নম্বর ক্যাম্বারওয়েল রোডের জন আন্ডারউড অ্যান্ড সন্স কোম্পানির তৈরি টুপি। বললে হোমস।

চোয়াল স্কুলে পড়ল গ্রেগসনের।

আপনিও যে লক্ষ করেছেন জানতাম না। গেছিলেন নাকি ওখানে।

না।

হা! হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন গ্রেগসন। সুযোগ যত ক্ষুদ্রই মনে হোক না কেন, কখনো তা পায়ে ঠেলবেন না।

বৃহৎ মনের কাছে ক্ষুদ্র বলে কিছুই নেই, অর্থপূর্ণ ভাবে বললে হোমস।

যাই হোক, আন্ডারউড়ে গিয়েছিলাম আমি। দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম এই মাপের এই চেহারার টুপি কাউকে বিক্রি করেছে কিনা। খাতাপত্র দেখে তৎক্ষণাৎ বলে দিল নাম আর ঠিকানা। টুপিখানা পাঠিয়েছিল টর্ক টেরেসের চাপেন্টিয়ার বোর্ডিং নিবাসী মি. ড্রেবারের কাছে। এইভাবেই পেলাম ঠিকানা।

স্মার্ট–অত্যন্ত স্মার্ট। বিড়বিড় করে বললে শার্লক হোমস।

এরপর দেখা করলাম ম্যাডাম চাপেন্টিয়ারের সঙ্গে। দেখলাম মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গিয়েছে ভদ্রমহিলাও খুব বিমর্ষ আর উদবিগ্ন! ভদ্রমহিলার মেয়েও ছিল ঘরের মধ্যে। ভারি চমৎকার মেয়ে–এক কথায় অসাধারণ! চোখ লাল। আমার কথা শুনে জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কিছুই নজর এড়াল না আমার। এ-অনুভূতি আপনি বুঝবেন মি. শার্লক হোমস। ঠিক গন্ধটি পেলে কীরকম একটা রোমাঞ্চ জাগে স্নায়ুর মধ্যে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের ভূতপূর্ব বোর্ডার ক্লিভল্যান্ড নিবাসী মি. এনক জে ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর পেয়েছেন?

মা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন বটে, কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। হু-হু করে কেঁদে ফেলল মেয়েটা। বুঝলাম এরা দুজনেই এ-ব্যাপারের অনেক কিছু জানে।

জিজ্ঞেস করলাম, ট্রেন ধরবার জন্যে ক-টার সময়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন মি. ড্রেবার?

আটটায়, উগত উত্তেজনাকে হাত দিয়ে গলায় ধরে রেখে বললে মেয়েটা। দুটো ট্রেন ছিল–বললেন ওঁর সেক্রেটারি মি. স্ট্যানজারসন। সোয়া ন-টায় আর এগারোটায়! উনি প্রথম ট্রেনটা ধরতে চেয়েছিলেন।

তারপর আর ওঁকে দেখেননি?

প্রশ্ন শুনেই ভয়ংকর পরিবর্তন লক্ষ করলাম ভদ্রমহিলার চোখে-মুখে। লাল হয়ে গেলেন।

না শব্দটুকু উচ্চারণ করতেই সময় নিলেন অনেকক্ষণ–তা-ও অস্বাভাবিক চাপা সুরে।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর শান্ত গলায় বললে মেয়ে, মিথ্যে বলে লাভ নেই মা, এঁকে সব খুলেই বলাই দরকার! হ্যাঁ, মি. ড্রেবারকে আবার দেখেছিলাম আমরা।

একী সর্বনাশ করলি। ককিয়ে উঠলেন ম্যাডাম চাপেন্টিয়ার, দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে এলিয়ে পড়লেন, চোয়াড়ে দাদাকে খুন করলি শেষকালে।

সত্যি না-বললে বরং আর্থারই খুন করত সবাইকে। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল মেয়ে।

আমি বললাম, খুলে বলুন। পেটে অর্ধেক মুখে অর্ধেক আরও খারাপ। তা ছাড়া, আপনারা যে কতটা জানেন তাও তো জানেন না!

অ্যালিস, তোর জন্যেই এই সর্বনাশ হল! শিউরে উঠলেন মা। তারপরেই ফিরলেন আমার দিকে। বললেন, ঠিক আছে, আমিই সব বলছি; ভাববেন না যেন ছেলে এই সাংঘাতিক ব্যাপারে জড়িয়ে আছে বলে ভয়ের চোটে বলছি। সে নির্দোষ একেবারেই। আমার ভয় কেবল আপনাদের চোখকে আর আইনের চোখকে ও-চোখে হয়তো বেচারা দোষী সাব্যস্ত হয়ে যেতে পারে। অবশ্য তা অসম্ভব। ওর পূর্ব পরিচয়, ওর পেশা, ওর চরিত্রে এ-কাজ সম্ভব নয়।

খুলে বলুন, কিছু লুকোবেন না। যদি সে নিরপরাধ হয়, আমার ওপর ভরসা রাখুন। বললাম আমি।

অ্যালিস, তুই বাইরে যা, মায়ের হুকুমে বেরিয়ে গেল মেয়ে। মেয়ে বেফঁস কথা না-বলে বসলে কিছুই বলতাম না। কিন্তু বলব বলে যখন ঠিক করেছি, কিছুই বাদ দোব না–সব বলব।

সোজা পথ কিন্তু সেইটাই, বললাম আমি।

হপ্তা তিনেক হল মি. ড্রেবার ছিলেন আমাদের সঙ্গে। মহাদেশ পর্যটনে বেরিয়েছেন দু-জনে উনি আর সেক্রেটারি মি. স্ট্যানজারসন। ওঁদের দুজনেরই ট্রাঙ্কে কোপেনহেগেন লেখা লেবেল দেখেছি। অর্থাৎ দু-জনেই লন্ডন আসার আগে কোপেনহেগেনে ছিলেন। স্ট্যানজারসন লোকটা অল্পভাষী, সংযত, শান্ত। কিন্তু তার অন্নদাতাটি ঠিক উলটো। হাবভাব চাষাড়ে, কথাবার্তা পাশবিক। সূক্ষ্মতার বালাই নেই–সবই ভুল। যেদিন এলেন সেই রাতেই বেহেড মাতাল হলেন আকণ্ঠ মদ গিলে–পরের দিন বারোটার মধ্যেই আর মানুষ পদবাচ্য রইলেন না। পরিচারিকাদের সঙ্গে দহরম-মহরম যদি দেখতেন! সবচেয়ে বিশ্রী হল ভদ্রলোক দু-দিনেই ঠিক একই ব্যবহার শুরু করলেন আমার মেয়ে অ্যালিসের সঙ্গে এবং একাধিকবার এমন সব কথা বলে বসলেন সৌভাগ্যক্রমে যার মানে বোঝার বয়স এখনও আমার মেয়ের হয়নি। একবার তো হাত ধরে অ্যালিসকে টেনে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সেক্রেটারি এই নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট বকাঝকা করেছিল অন্নদাতাকে। এ কী বর্বরতা!

আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, সহ্য করলেন কেন? পছন্দ না-হলে বোর্ডারকে বিদেয় করার অধিকার নিশ্চয় আপনার আছে?

মোক্ষম প্রশ্ন শুনে মুখ লাল করে ফেললেন মিসেস চারপেন্টিয়ার। বললেন, যেদিন এসেছিলেন সেদিনই বিদায় করা উচিত ছিল। কিন্তু কী জানেন, পারিনি শুধু একটা

প্রলোভনের জন্যে। মাথাপিছু এক এক পাউন্ড প্রতিদিন সাত দিনে চোদ্দো পাউন্ড। বছরের এ সময়ে বোর্ডিং হাউস ফাঁকা যায় চোদ্দো পাউন্ড তাই কম কথা নয়। আমি বিধবা মানুষ, এক ছেলেকে নৌবাহিনীতে ঢোকাতে গিয়ে দেউলে হতে বসেছি। তাই অতগুলো টাকা ছাড়তে পারিনি। সব সহ্য করে যাচ্ছিলাম–শেষেরটা বাদে। নোটিশ দিলাম। বলে দিলাম অমন অসভ্য বোর্ডার দরকার নেই। ওঁরা বিদেয় হয়েছিলেন এইজন্যেই।

তারপর?

গাড়ি হাঁকিয়ে সত্যি সত্যিই বিদেয় হতে মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। ছেলে এখন ছুটিতে রয়েছে। এসব কথা ওর কানে তুলিনি ওর বদমেজাজের জন্যে তার ওপরে বোন-অন্ত প্রাণ। তাই মি. ড্রেবারকে বিদেয় করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু কী কপাল দেখুন, এক ঘন্টা যেতে-না-যেতে ফের বেজে উঠল ঘণ্টা খবর এল ড্রেবার ফিরে এসেছেন। ভীষণ উত্তেজিত এবং চুরচুরে মাতাল অবস্থায়। মেয়েকে নিয়ে যে-ঘরে বসেছিলাম, জোর করে ঢুকে পড়লেন সে-ঘরে। ট্রেন ফেল করার অজুহাতস্বরূপ অসংলগ্নভাবে অনেক কথা বলবার পর ঘুরে দাঁড়ালেন অ্যালিসের দিকে। আমার সামনেই প্রস্তাব করলেন অ্যালিসকে সেই মুহূর্তে যেন তার সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে পালায়। বললেন, তুমি এখন প্রাপ্তবয়স্কা—তোমাকে আটকে রাখার আইন দেশে নেই। আমার অনেক টাকা খরচ করতে চাই। এ-বুড়িটার কথা ভেবো না। বেরিয়ে এসো আমার সঙ্গে! রানি বানিয়ে রাখব তোমাকে। ভীষণ ভয়ে কুঁকড়ে সরে যেতে চাইল অ্যালিস বেচারা, কিন্তু মি. ড্রেবার ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললেন

দরজার দিকে। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকল আমার ছেলে আর্থার। তারপর কী হয়েছে জানি না। গালিগালাজ আর ধস্তাধস্তির আওয়াজটুকু কেবল মনে আছে। আতঙ্কে কাঠ হয়ে গিয়ে মাথা পর্যন্ত তুলতে পারিনি। তোলবার পর দেখলাম দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর্থার হাতে একটা লাঠি। বললে, এ-পথ আর মাড়াবে বলে মনে হয় না। তবুও পেছন পেছন গিয়ে দেখে আসা যাক শেষটা। টুপি নিয়ে রাস্তায় নেমে গেল আর্থার। পরের দিন সকালে মি. ড্রেবারের রহস্যজনক মৃত্যুর খবর শুনলাম।

অনেক খাবি খেয়ে অনেকবার থেমে নিজের মুখে বিবৃতিটা দিলেন মিসেস চার্পেন্টিয়ার। মাঝে মাঝে গলার স্বর এমন থেমে গেল যে স্পষ্টভাবে শব্দগুলো শুনতে পেলাম না। পাছে ভুল হয়, তাই প্রত্যেকটা কথা শর্টহ্যান্ডে° লিখে নিলাম আমার নোটবইতে।

হাই তুলে শার্লক হোমস বলল, খুব উত্তেজক বিবৃতি! তারপর কী হল বল।

মিসেস চার্পেন্টিয়ারের সব কথা শোনবার পর দেখলাম পুরো কেসটাই নির্ভর করছে একটা পয়েন্টের ওপর। বিশেষ এক কায়দায় মেয়েদের দিকে চেয়ে জেরা করে অনেকবার সুফল। পেয়েছি আমি। মিসেস চাপেন্টিয়ারের দিকে সেভাবে চেয়ে অনেক কথা জিজ্ঞেস করলাম, তার ছেলে বাড়ি ফিরেছিল কখন।

জানি না, বললেন ভদ্রমহিলা।

জানেন না?

না; ওর কাছে ল্যাচের চাবি থাকে। নিজেই বাড়ি ফিরেছিল।

আপনি শুয়ে পড়ার পর?

হ্যাঁ।

কখন শুয়েছিলেন আপনি?

এগারোটা নাগাদ।

আপনার ছেলে তাহলে কমসেকম দু-ঘণ্টা বাইরে ছিল?

হ্যাঁ!

চার পাঁচ ঘণ্টাও হতে পারে।

তা পারে।

কী করছিল অতক্ষণ?

জানি না, বলতে বলতে ঠোঁট সাদা হয়ে গেল ভদ্রমহিলার।

এরপর আর কিছু করার ছিল না। লেফটেন্যান্ট চার্পেন্টিয়ার কোথায় আছে জেনে নিয়ে দু-জন অফিসারের সঙ্গে সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার করলাম তাকে। কাঁধে হাত দিয়ে যেই বলেছি চেঁচামেচি না-করে চুপচাপ সঙ্গে আসতে, অমনি বুক ফুলিয়ে তেজ দেখিয়ে বললে স্কাউড্রেল ড্রেবারের মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করছেন? কী জন্যে গ্রেপ্তার করছি কিছুই বলিনি। তা সত্ত্বেও নিজে থেকেই প্রসঙ্গটা উল্লেখ করা খুবই সন্দেহজনক।

খুবই, বললে হোমস।

লাঠিটা সঙ্গেই ছিল। ভারী লাঠি। ড্রেবারের পেছন পেছন যাওয়ার সময়ে নিয়ে বেরিয়েছিল মা নিজে বলেছেন। বেশ মোটা ওক কাঠের মুগুর!

তোমার থিয়োরিটা তাহলে কী দাঁড়াল?

ব্রিক্সটন রোড পর্যন্ত পেছন পেছন গিয়েছিল। ড্রেবারের সঙ্গে আর একদফা কথা কাটাকাটি হয় সেখানে! আর্থার মুগুর দিয়ে মরণ মার মারে তলপেটে এক মারেই অক্কা পান ড্রেবার–ক্ষতচিহ্ন দেখা যায়নি সেই কারণেই। বৃষ্টি পড়ছে তখন। রাস্তা ফাঁকা। লাশ টেনে নিয়ে একটা ফাঁকা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল চাপেন্টিয়ার। মোমবাতি, রক্ত,

দেওয়ালে লেখা আর আংটি হল পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার চেষ্টা তদন্ত যাতে অন্য খাতে বয়ে যায়।

শাবাশ! পিঠ চাপড়ানো স্বরে বললে হোমস। সত্যিই গ্রেগসন, তোমাকে আর আটকানো গেল না। আরে যশের মুকুট তোমার কপালেই নাচছে!

বুক ফুলিয়ে গর্বিত স্বরে বললে ডিটেকটিভ, নিজের মুখে বললে তো অহংকার শোনায়, কিন্তু ব্যাপারটা কী চমৎকার গুছিয়ে ফেলেছি দেখুন। আর্থার চাপেন্টিয়ার একটা জবানবন্দি দিয়েছে স্বেচ্ছায়। বলেছে, ড্রেবারকে কিছুদুর ফলো করার পর ভয়ের চোটে লোকটা একটা ঘোড়ার গাড়ি চেপে পালিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে একজন পুরানো জাহাজি দোস্তের সঙ্গে দেখা হয় আর্থারের হাঁটতে হাঁটতে দুই বন্ধু চলে যায় অনেক দূর। বন্ধুটি কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করে কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইনি। কেসটা মিটে এসেছে বলেই আমার বিশ্বাস গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবক-টা খাপছাড়া ব্যাপারই দেখুন কী সুন্দর খাপে খাপে বসে গিয়েছে–ফাঁক নেই কোথাও। লেসট্রেড বেচারির কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে। ভুল সূত্র নিয়ে দৌড়ে মরছে। কাদা ঘাঁটাই সার হবে। আরে, বলতেই এসে গেছে লেসট্রেড।

লেসট্রেডই বটে। আমরা যখন কথায় মগ্ন ও তখন সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে। এখন ঢুকল ঘরে। ওর হাবভাব পোশাক পরিচ্ছদে সব সময়ে আত্মবিশ্বাস আর ফুর্তিবাজ মেজাজ লেগে থাকে–এখন তা নেই। মুখভাব বিচলিত, ক্লিষ্ট; পোশাক অবিন্যস্ত, অপরিচ্ছন্ন। এসেছিল নিশ্চয় শার্লক হোমসের সঙ্গে শলাপরামর্শ করার জন্যে, তাই

সতীর্থকে আগেই সেখানে হাজির দেখে বিব্রত হল খুবই–চুপসে গেল ফুটো বেলুনের মতো। ঘরের ঠিক মাঝখানে নার্ভাসভাবে টুপিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনিশ্চিতভাবে–কী যে করা উচিত যেন ঠিক করে উঠতে পারছে না। শেষকালে আর থাকতে না-পেরে বললে, ভারি গোলমেলে কেস অত্যন্ত অসাধারণ, অত্যন্ত দুর্বোধ্য।

বিজয় গৌরবে ফেটে পড়ল গ্রেগসন, এতক্ষণে তা বুঝলেন! আমি অবশ্য আগেই জানতাম এ-সিদ্ধান্তে আপনাকে আসতেই হবে। সেক্রেটারি মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনকে খাঁচায় পুরতে পারলেন কি?

গম্ভীরভাবে বললে লেসট্রেড, আজ ভোর ছটায় হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে খুন হয়েছে সেক্রেটারি, মি. জোসেফ স্ট্যানজারসন।

অন্ধকারে আলো

বুদ্ধিমত্তার চমক দিয়ে লেসট্রেড আমাদের তিনজনকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে ছাড়ল কিছুক্ষণের জন্য চমৎকৃত হলাম অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত আর সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ এই সংবাদের প্রসাদে। চেয়ার ছেড়ে ছিটকে যেতে গিয়ে গ্রেগসন বেচারি হুইস্কি আর জলের বাকিটুকু উলটে ফেলে দিলে মেঝের ওপর। আমি শব্দহীন বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলাম শার্লক হোমসের দিকে দেখলাম ওর ঠোঁট দৃঢ়সংবদ্ধ, ললাট গ্রন্থিল, ভুরু বেঁকে নেমে এসেছে চোখের ওপর।

বললে বিড় বিড় করে, স্ট্যানজারসনও! চক্রান্ত আরও কুটিল হচ্ছে দেখছি।

হয়েছে অনেক আগেই, চেয়ার টেনে নিয়ে বললে লেসট্রেড। আমি তো বলতে গেলে একটা যুদ্ধ মন্ত্রণাসভার ভেতরেই ঢুকে পড়েছি।

তোতলাতে তোতলাতে গ্রেগসন বললে, খবরটা পাকা তো?

ভদ্রলোকের ঘর থেকেই সোজা আসছি আমি। লাশটা প্রথম আমিই দেখি, বলতে লেসট্রেড।

হোমস বললে, মামলাটা সম্বন্ধে গ্রেগসনের মতামত শুনছিলাম। তুমি কী দেখেছ, ক, পেয়েছ যদি বল তো শুনি।

আপত্তি নেই, চেয়ারে বসতে বসতে বলল লেসট্রেড। প্রথমেই স্বীকার করছি, আমার ধারণা ছিল ড্রেবার হত্যায় স্ট্যানজারসনের হাত আছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বুঝছি বিষম ভুল করেছি। মাথায় তখন একটা ধারণাই পাক দিচ্ছে স্ট্যানজারসনের হদিশ বার করার জনে; উঠে-পড়ে লাগলাম। তেসরা রাত সাড়ে আটটায় ইউস্টন স্টেশনে দেখা গেছে দু-জনকে দুটোর সময়ে ড্রেবারের লাশ পাওয়া গেছে ব্রিক্সটন রোডে! সাড়ে আটটা থেকে রাত দুটো পর্যন্ত সেক্রেটারি কী করছিল এবং তারপর কোথায় ছিল–এই প্রশ্নের জবাব আমাকে পেতেই হবে। টেলিগ্রাম পাঠালাম লিভারপুলে। পলাতকের দৈহিক বিবরণ দিয়ে বললাম আমেরিকাগামী জাহাজগুলোর উপর যেন নজর রাখা হয়। তারপর খোঁজ নিতে বেরোলাম ইউস্টনের কাছাকাছি হোটেলে আর থাকার জায়গায়। ভেবে দেখলাম, ড্রেবারের সঙ্গছাড় হওয়ার পর সেক্রেটারি নিশ্চয় ধারেকাছেই রাত কাটাবে–সকাল হলেই স্টেশনে ঘুরঘুর করবে সটকান দেওয়ার জন্যে।

খুব সম্ভব কোথাও দু-জনের দেখা করার ব্যবস্থাও হয়েছিল, মন্তব্য করল হোমস।

এখন তাই দেখছি। গতকাল পুরো সন্ধেটা বৃথাই তদন্ত করে কাটালাম, লাভ হল না। আজ সকালে লাগলাম খুব ভোর থেকেই আটটায় পৌঁছোলাম লিটল জর্জ স্ট্রিটের হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে। মি. স্ট্যানজারসন নামধারী কেউ আছেন কিনা খোঁজ করতেই ওরা বললে, হা আছেন।

বললে, দু-দিন ধরে এক ভদ্রলোকের পথ চেয়ে বসে আছেন। আপনি নিশ্চয় সেই ভদ্রলোক।

কোথায় উনি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

শুয়ে আছেন–ওপরতলায়। ডাকতে বলেছেন ন-টার সময়ে।

এক্ষুনি যাচ্ছি দেখা করতে।

ভেবেছিলাম আচমকা আমাকে দেখে ঘাবড়ে যাবে স্ট্যানজারসন–মুখ ফসকে বেরিয়ে আসবে অনেক কথা। জুতো পরিষ্কার করে যে-চাকরটা, সে-ই আমাকে নিয়ে গেল ওপরের ঘরে তিনতলায়। ছোট্ট একটা করিডর পেরিয়ে ঢুকতে হয় ঘরে। চাকরটা দরজাটা আঙুল দেখিয়ে নেমে যেতে যাচ্ছে, এমন সময় গা শিরশির করে উঠল একটা জিনিস দেখে বিশ বছরের কর্মজীবনে এভাবে কখনো লোম খাড়া হয়নি। দরজার তলা দিয়ে রক্তের একটা সরু ধারা বেরিয়ে এসে করিডরের ওপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে গিয়ে থই থই আকারে জমা হয়েছে অপরদিকে। চেঁচিয়ে উঠতেই ছুটে এল চাকরটা। ওই দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যায় আর কী! দরজায় ভেতর থেকে চাবি দেওয়া দেখে দু-জনেই কাঁধের চাড় দিয়ে তালা ভেঙে ফেললাম। ঘরের জানালা খোলা। জানলার পাশে তালগোল পাকিয়ে পড়ে রাত্রিবাস পরা একটা পুরুষ মূর্তি। মরে একদম কাঠ হয়ে গেছে মরেছে অনেকক্ষণ, কেননা হাত পা একদম ঠান্ডা আড়ষ্ট। উঠে চিত করে শোয়ানোর পর

চিনতে পারলে চাকরটা–মি. জোসেফ স্ট্যানজারসন–দু-দিন আগে এই ঘরে উঠেছিল। মৃত্যুর কারণ বুকের বাঁ-দিকে একটা ছুরিকাঘাত–হৃৎপিণ্ড নিশ্চয় এফোঁড়-ওফোড় হয়ে গিয়েছে। সবচাইতে অদ্ভুত ঘটনাটা বলছি এবার। কল্পনা করতে পারেন কী লেখা ছিল নিহত ব্যক্তির গায়ের ওপরে?

আসন্ন বিভীষিকার পূর্ববোধে গা ছমছম করে উঠল আমার। জবাব দিল শার্লক হোমস।

বললে, সেই শব্দটা—র‌্যাচি।

ঠিক বলেছেন, শ্রদ্ধাচ্ছন্ন কণ্ঠে বলল লেসট্রেড। কিছুক্ষণ আর কেউ কথা বলতে পারলাম—নির্বাক নিস্পন্দ।

অজ্ঞাত এই গুপ্তঘাতকের ক্রিয়াকলাপ যেমন দুর্বোধ্য, তেমনি পদ্ধতিমাফিক। অপরাধগুলো নতুন চেহারা নিয়েছে আরও বিকট, আরও করাল হয়ে উঠেছে। রণক্ষেত্রে আমার স্নায়ু অটল থেকেছে, এখন আর থাকছে না।

কথার খেই তুলে নিয়ে বললে লেসট্রেড, লোকটাকে দেখা গেছে। হোটেলের পেছনে অনেকগুলো আস্তাবল আছে—খোলা উঠোনের চারিদিকে সারি সারি আস্তাবল। একটা সরু গলি বেরিয়েছে এই উঠোন থেকে। গয়লাদের ছেলে এই গলি দিয়ে যাচ্ছিল গোয়ালে। আগেও সে দেখেছে একটা মই থাকে সেখানে। এখন দেখল মইটা লাগানো রয়েছে তিনতলার একটা দু-হাট করে খোলা জানলার সামনে। যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে

দেখলে একটা লোক নেমে আসছে মই বেয়ে। এমন সহজ আর খোলাখুলিভাবে নামছে যে ছেলেটা ভাবলে হয়তো ছুতোর মিস্ত্রি হোটেলের কাজ করতে এসেছে। তাই আর সেরকমভাবে দেখেনি–তবে খটকা লেগেছে এত ভোরে কাজে আসায়। ওই এক পলকে যতটুকু দেখেছে তাতে মনে হয় লোকটা মাথায় বেশ ঢ্যাঙা, মুখ বেশ লাল, গায়ে লম্বা বাদামি রঙের কোট। খুন করার পরেও নিশ্চয় সে ঘরে ছিল অনেকক্ষণ। রক্তগোলা জল পেয়েছি হাত ধোওয়ার জলপাত্রে খুন করে হাত ধুয়েছিল। বেশ করে ছুরির রক্তও মুছেছে বিছানার চাদরে।

হোমস-প্রদত্ত হত্যাকারীর বর্ণনার সঙ্গে এই বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। তাকালাম বন্ধুবরের দিকে। উল্লাসবোধ বা সন্তুষ্টির চিহ্নমাত্র দেখলাম না মুখে।

জিজ্ঞেস করল, খুনের সূত্র হতে পারে এমন কিছু পেয়েছ ঘরে?

কিসসু না। ড্রেবারের মানিব্যাগ পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের পকেটে। সেটা স্বাভাবিক–কেননা ড্রেবারের খরচপত্র তাকেই সব করতে হত। আশি পাউন্ড ছিল মানিব্যাগেকানাকড়িও খোওয়া যায়নি। অসাধারণ এই খুনের উদ্দেশ্য আর যাই থাকুক না কেন, চুরি ডাকাতি অন্তত নয়। নিহত ব্যক্তির পকেটে ক্লিভল্যান্ড থেকে পাঠানো একটা টেলিগ্রাম ছাড়া আর কোনো কাগজ বা স্মারকলিপি পাইনি। টেলিগ্রামে লেখা ছিল জে. এইচ. ইউরোপে রয়েছেন। কিন্তু কে পাঠিয়েছে খবরটা, সে-রকম কোনো নাম নেই তলায়।

এ ছাড়া আর কিছু পাওনি? প্রশ্ন করে হোমস।

গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পাইনি। ঘুম আনার জন্যে একটা নভেল পড়ছিল স্ট্যানজ্যারসন, বিছানার পাশেই তা রয়েছে, পাশের চেয়ারে তামাক খাওয়ার নিজের পাইপ। টেবিলে এক গেলাস জল। জানলার গোবরাটে একটা সস্তার মলমের কৌটোয় খান দুই বড়ি।

বিপুল হর্ষে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল শার্লক হোমস। বলল সোল্লাসে, কেস সম্পূর্ণ। শেষ যোগসূত্রটাও এসে গেল হাতে।

সবিস্ময়ে চেয়ে রইল গোয়েন্দা যুগল।

আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বন্ধুবর বললে, জট সৃষ্টি হয়েছে যে-কটা সুতোয়, তার সবক-টাই এসে গেল তার হাতে। মাঝখানে কিছু বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন অবশ্য আছে। তবে মূল ঘটনাগুলো সব জানা হয়ে গেছে। স্টেশনে ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর থেকে স্ট্যারজারসনের মৃতদেহ পাওয়া পর্যন্ত কী কী ঘটেছিল, সব আমি নিজের চোখে দেখেছি–এত ভালোভাবে জানি। আমার এই জানার প্রমাণও দিচ্ছি। বড়িগুলোয় হাত দিয়েছিলে?

একটা ছোটো সাদা কৌটো বাড়িয়ে ধরে লেসট্রেড বললে, সঙ্গে এনেছি। মানিব্যাগ, টেলিগ্রাম আর কৌটো নিয়ে যাচ্ছি পুলিশ ফাঁড়িতে নিরাপদে জমা রাখার জন্যে। বড়ি

নিয়ে লাভ অবশ্য কিছুই হবে না। কেননা এর মধ্যে তিলমাত্র গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না।

দাও আমাকে, বললে হোমস। আমার দিকে ফিরে ডাক্তার, এবার তুমি বলো, এ-বড়ি কি সাধারণ বড়ি?

সাধারণ নিশ্চয় নয়। রংটা মুক্তোর মতো ধূসর, আকারে ছোটো গোলাকার এবং আলোর সামনে ধরলে স্বচ্ছ। বললাম–বড়ি যখন এত হালকা আর স্বচ্ছ তখন নিশ্চয় জলে দিলে গুলে যাবে।

ঠিক বলেছ, বললে হোমস। এবার একটা উপকার করো তো। টেরিয়ার কুকুরটার যন্ত্রণার শেষ করার জন্যে গতকাল ল্যান্ডলেডি তোমাকে বলছিলেন। যাও, নিয়ে এসো তাকে।

নীচতলায় গিয়ে কোলে করে কুকুরটাকে নিয়ে এলাম ঘরে। কষ্ট-নিশ্বাস আর অর্ধ স্বচ্ছ চক্ষু দেখেই বুঝলাম মৃত্যু সন্নিকটে। বেচারার সারমেয়-পরমায়ু অনেক আগেই ফুরিয়েছে, তুষারধবল নাক মুখেও তা সুস্পষ্ট। মেঝের কম্বলে গদি পেতে শুইয়ে দিলাম তাকে।

দুটো বড়ির একটাকে এবার আমি দু-টুকরো করছি, বলতে বলতে কলম-কাটা ছুরি বার করল হোমস। আধখানা থাকবে কৌটোয় ভবিষ্যতে প্রয়োজনের জন্যে। বাকি আধখানা

রাখব এই মদের গেলাসে সেইসঙ্গে এক চামচ জল। দেখলে তো, ডাক্তার ঠিক বলেছে। জলে গুলে গেল বড়ি।

আপনার কাছে এক্সপেরিমেন্টটা কৌতূহলোদ্দীপক মনে হতে পারে, কিন্তু মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনের মৃত্যুর সঙ্গে এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝছি না, আহত কণ্ঠে বললে লেসট্রেড। ভাবখানা ওকে যেন উপহাস করার চেষ্টা চলছে।

ধৈর্য ধর, বন্ধু ধৈর্য ধর? সম্পর্কটা যে অত্যন্ত নিবিড়, যথাসময়ে তা দেখবে। এবার একটু দুধ মেশাচ্ছি মিক্সচারে যাতে খেতে স্বাদু হয়–কুকুরটার সামনে ধরলেই যাতে এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেলে।

কথার সঙ্গে মদের গেলাস থেকে তরল পদার্থটা একটা ডিশে ঢেলে রাখল টেরিয়ারের সামনে এবং তৎক্ষণাৎ চেটেপুটে ডিশ সাফ করে দিল মৃত্যুপথযাত্রী সারমেয়। শার্লক হোমসের আন্তরিকতায় আমাদের প্রত্যেকেরই বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে সত্যিই চমকপ্রদ কিছু এবার ঘটবে, তাই সাগ্রহে বিপুল প্রত্যাশা নিয়ে চেয়ে রইলাম টেবিলের দিকে। কিছুই অবশ্য ঘটল না। গদির ওপর শুয়ে আগের মতোই অতি কষ্টে নিশ্বাস নিয়ে চলল কুকুরটা বড়ি খেয়ে অবস্থার উন্নতি ঘটল কি অবনতি ঘটল কিছুই বোঝা গেল না।

ঘড়ি নিয়ে সময় দেখছিল হোমস। পরিণতিহীন এক একটা মিনিট অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিঃসীম নৈরাশ্য আর বিরক্তিবোধ ফুটে উঠেছে মুখের পরতে পরতে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, টেবিলের ওপরে আঙুলের বাদ্যি বাজাচ্ছে এবং সর্ববিধ উপায়ে আতীব্র

অসহিষ্ণুতাকে প্রকট করে তুলছে। বেচারির আবেগের তীব্রতায় আমি দুঃখ পেলেও গোয়েন্দাযুগল বিদ্রুপের হাসি হেসে বুঝিয়ে দিলে যে শার্লক হোমসকে কুপোকাত অবস্থায় দেখে তারা মোটেই অখুশি হয়নি।

অবশেষে চেয়ার ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠল হোমস, কাকতালীয় কখনোই নয়–হতেই পারে না, ঘরময় বেগে পদচালনা করতে করতে অসম্ভব, নিছক কাকতালীয়র জন্যে এমন হতে পারে এ আমি বিশ্বাস করি না। ড্রেবারের মৃত্যুতে যে-বড়ি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ করেছিলাম–হুবহু সেই বড়ি পাওয়া গেছে স্ট্যানজারসনের মৃত্যুর পর। তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে বড়ি নির্বিষ। এর কী মানে হতে পারে বলতে পার? আমার যুক্তির শৃঙ্খল আগাগোড়া মিথ্যে হতে পারে না কিছুতেই কখনো না। অসম্ভব! অথচ দেখেছ মরতে বসেও কুত্তাটার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগল না। আ। পেয়েছি। পেয়েছি! ভীষণ আনন্দে বিকট চেঁচিয়ে কৌটোর দিকে দৌড়ে গেল হোমস। বাকি বড়িটা কাটল দু-ভাগে, আধখানা জলে গুলে দুধ মিশোলে তাতে, খেতে দিল টেরিয়ারকে। সে বেচারা জিভটা ঠেকাতে-না-ঠেকাতেই সমস্ত শরীর সাংঘাতিকভাবে কাঁপিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে গিয়ে মরে কাঠ হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ বজ্রাহত হওয়ার মতো।

গভীর শ্বাস নিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল শার্লক হোমস।

বলল, আত্মবিশ্বাস আরও একটু বেশি থাকলে ভালো হত। এত চর্চা আর অভিজ্ঞতার পর আমার জানা উচিত ছিল সুদীর্ঘ সিদ্ধান্ত-পরম্পরার শেষে যখন একটা ঘটনা দেখা দেয়, তখন অবশ্যই তার একটা মানে থাকতে পারে। কৌটোর দুটো বড়ির একটা

অত্যন্ত মারাত্মক বিষ, আর একটা একেবারে নির্বিষ। কৌটোটা চোখে দেখার আগেই ব্যাপারটা আঁচ করা উচিত ছিল আমার।

শেষ কথাটায় এমন চমক খেলাম যে শার্লক হোমসের মাথা ঠিক আছে কিনা সন্দেহ হল আমার ! অবশ্য মরা কুকুরটাই ওর সঠিক অনুভূতির অভ্রান্ত প্রমাণ। আস্তে আস্তে বুঝলাম কুয়াশা কেটে যাচ্ছে আমার মনের মধ্যে থেকে অস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছি আবছা সত্যকে।

হোমস কিন্তু বলেই চলেছে, তদন্তের গোড়াতেই সবেধন নীলমণি আসল সূত্রটি হাতে আসা সত্ত্বেও তার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারনি বলেই সব কিছুই এত ধোঁয়াটে মনে হচ্ছে তোমাদের চোখে। সৌভাগ্যক্রমে প্রথমেই সূত্রটা ঠাহর করেছিলাম আমি। তারপর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই সেই সূত্রের সঙ্গে সংগতি রেখেছে এবং আমার সিদ্ধান্তকে সবল করেছে। যা অদ্ভুত, তাই নাকি রহস্য–এই ভুল অনেকে করে। সবচেয়ে মামুলি কেসকেই অনেক সময়ে সবচেয়ে ঘোরালো কেস মনে হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর্যুক্ত নতুন বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না বলে। এ-কেসও অত্যন্ত রহস্য ঢাকা মনে হত যদি লাশ পাওয়া যেত রাস্তার ওপর এবং যেসব চাঞ্চল্যকর সহ-ঘটনা আর বস্তুর জন্যে এ-কেসের এত বৈচিত্র্য তা যদি না-থাকত। অদ্ভুত এই বৈচিত্র্যগুলোই কেসটাকে জটিলতর করার বদলে বরং জলের মতো সোজা করে তুলেছে।

অত্যন্ত অসহিষ্ণুভাবে বক্তৃতা শুনছিল গ্রেগসন। আর সহ্য করতে পারল না। বলল, মি. শার্লক হোমস, মানছি আপনি যথেষ্ট স্মার্ট, আপনার কাজের ধারাও আলাদা। কিন্তু এই

মুহূর্তে বক্তৃতার বদলে বস্তু চাই–থিয়োরির বদলে প্রমাণ। খুনিকে গ্রেপ্তার করাটাই আসল কাজ। সেটা আমি করেছি। কিন্তু মনে হচ্ছে ভুল করেছি। দ্বিতীয় ক্রাইমে চাপেন্টিয়ার ছোকরার হাত নেই। খুনি সন্দেহে স্ট্যানজারসনের পেছন নিয়েছিল লেসট্রেড দেখা যাচ্ছে সে-ও ভুল করেছে! আপনি মাঝে মাঝে অনেকরকম আভাস ছাড়ছেন বটে, কিন্তু আসল কথাটি ভাঙছেন না। মনে হচ্ছে আপনি আমাদের চাইতেও খবর রাখেন বেশি। কিন্তু পরিস্থিতি এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে কথাটা জিজ্ঞেস করা দরকার বলে মনে করি এবং সে-অধিকারও আমাদের আছে। সোজা জিজ্ঞেস করছি, বলুন আপনি এ-কেসের কদ্দূর জেনেছেন? খুন যে করেছে তার নাম বলতে পারেন?

লেসট্রেড বলে উঠল, স্যার, গ্রেগসন আমার মনের কথাই বলছে। চেষ্টা করেছি আমরা দু-জনেই, বিফলও হয়েছি দু-জনে। আমি ঘরে আসার পর থেকেই কিন্তু আপনি বার বার বলছেন মামলা সমাধানের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ যা দরকার সব হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছেন। আর তো সেসব চেপে বসে থাকা মানায় না।

আমিও বললাম, খুনিকে গ্রেপ্তার করতে এখন যত দেরি হবে, নতুন খুনখারাপির সুযোগ পাবে তত বেশি।

সবাই মিলে চাপ দেওয়ায় দোনামোনায় পড়ল শার্লক হোমস। ফের পদচালনা শুরু করল ঘরময়, চিবুক ঠেকে রইল বুকে এবং দুই ভুরু জট পাকিয়ে নেমে এল নীচে–চিন্তামগ্ন থাকলেই যা করে আর কী।

খুন আর হবে না, হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে বললে আমাদের দিকে ফিরে, সম্ভাবনা একেবারেই নেই–নিশ্চিন্ত থাকতে পার। গুপ্তঘাতকের নাম জানি কিনা জিজ্ঞেস করেছিলে? হ্যাঁ, জানি। লোকটাকে ধরাটাই এখন মোদ্দা সমস্যা নাম জানা সে তুলনায় কিছুই নয়। মোদ্দা সমস্যাটার মোকাবিলা করব শিগগিরই নিজেই করব। ব্যবস্থাও করেছি। তবে খুব সাবধানে এগোনো দরকার। কেননা যাকে আমরা খুঁজছি সে নিজেই যে শুধু মরিয়া আর ধড়িবাজ তা নয়, তাকে মদত জোগাচ্ছে তারই মতো আরও এক চতুর চূড়ামণি। যতক্ষণ সে জানছে পুলিশ তাকে সন্দেহ করার মতো সূত্র পায়নি ততক্ষণ তাকে ধরবার সম্ভাবনাও থাকছে। কিন্তু যে-মুহূর্তে সে টের পাবে পুলিশ তাকে খুঁজছে, সেই মুহূর্তে নাম পালটে হারিয়ে যাবে চল্লিশ লক্ষ লন্ডন বাসিন্দার মধ্যে। তোমাদের আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু সত্যি কথাটাও না-বলে পারছি না। ধড়িবাজ এই লোকটার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো আদমি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নেই জেনেই তোমাদের কারও সাহায্য চাইনি পাছে সব ভণ্ডুল হয়ে যায়। যদি বিফল হই, তোমাদেরকে দলে না-টানার পুরো অপরাধ মাথা পেতে নেব। এই মুহূর্তে শুধু বলব আমার নিজস্ব ব্যবস্থা বানচাল না-করে যেটুকু তোমাদের জানানো যায়, সেটুকু নিশ্চয় জানাব।

স্তোকবাক্য শুনে খুব খুশি হয়েছে বলে মনে হল না গ্রেগসন বা লেসট্রেড ডিটেকটিভ পুলিশের পক্ষে কলঙ্কজনক এই অভিমতটুকুও মনঃপূত হয়নি বোঝা গেল। গ্রেগসনের সাদা চুলের গোড়া পর্যন্ত যেন লাল হয়ে গেল এহেন উক্তিতে লেসট্রেডের কুতকুতে চোখ দুটোয় চিকচিক করে উঠল কৌতূহল আর ক্রোধ। কেউ কোনো কথা বলার আগেই অবশ্য দরজায় টোকা মারার আওয়াজ শোনা গেল এবং পরমুহূর্তেই অখাদ্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হল রাস্তার ছেলেদের মুখপাত্র দীনহীন উইগিন্স।

কপালের চুল ছুঁয়ে বললে, গাড়ি এনেছি, স্যার।

মৃদুকণ্ঠে বললে হোমস, বেশ করেছ। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে এ-জিনিস চালু করতে পার না। ড্রয়ার থেকে একজোড়া হাতকড়া বার করে, দেখেছ কী সুন্দর এর স্প্রিংয়ের কাজ? এক পলকেই আটকে যায়।

লেসট্রেড বললে, লোকটাকে পেলে পুরোনো হাতকড়াতেই কাজ হত!

চমৎকার! চমৎকার! স্মিত মুখে বললে হোমস, বাক্স প্যাটরাগুলো কোচোয়ানের হাতে পাচার করলে ভালো হত। উইগিন্স, যা তো, পাঠিয়ে দে।

বন্ধুবরের বাইরে যাওয়ার আয়োজন দেখে অবাক হলাম কিছুই তো বলেনি আমাকে। ঘরের কোণে একটা ছোটো পোর্টম্যান্টো ব্যাগ বসানো ছিল। টেনে এনে ঘরের মাঝে রেখে স্ট্র্যাপ খুলছে হোমস এমন সময়ে গাড়িওলা ঢুকল ঘরে।

মাথা না-ঘুরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে স্ট্র্যাপ টানাটানি করতে করতে হোমস বললে, ওহে, একটু হাত লাগাও তত বাক্সটায়।

রগচটা, বেপরোয়া ভঙ্গিমায় এগিয়ে এসে হাত নামাল গাড়োয়ান। ঠিক তখনই একটা তীক্ষ্ণ কটাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধাতব ঝনঝনানি আওয়াজ ভেসে এল কানে। একই সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল শার্লক হোমস।

বললে প্রদীপ্ত চোখে উল্লসিত কণ্ঠে, জেন্টেলমেন, আসুন আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই মি. জেফারসন হোপের ইনিই খুন করেছেন এনক ড্রেবার আর জোসেফ স্ট্যানজারসনকে।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পাতা ফেলার আগেই এত চকিতে যে বোঝবার সময় পর্যন্ত আমি পেলাম না। চোখের সামনে এখনও কিন্তু জ্বলজ্বল করছে সেই দৃশ্য। হোমসের জয়দৃপ্ত মুখচ্ছবি আর উল্লাসময় কণ্ঠধ্বনি, গাড়িওলার হতচকিত বর্বর মুখভাব—যেন মন্ত্রবলে আবির্ভূত কবজিতে বদ্ধ হাতকড়ার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত চোখে। সেকেন্ডখানেক কি দুয়েক আমরা সকলেই পর্যবসিত হলাম একদল মর্মরমূর্তিতে। পরমুহূর্তেই একটা গভীর, চাপা ক্রুদ্ধ গর্জন ছেড়ে এক ঝটকায় হোমসের মুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে আছড়ে পড়ল জানালার ওপর। প্রচণ্ড শব্দে চুরমার হয়ে গেল কাঠ আর কাচ–জানলা গলে পুরো দেহটা বেরিয়ে যাওয়ার আগেই পেছন থেকে একপাল স্ট্যাগ হাউন্ডের মতো ধেয়ে গিয়ে আঁকড়ে ধরল লেসট্রেড গ্রেগসন আর হোমস। টানতে টানতে নিয়ে এল ঘরের মাঝে এবং শুরু হয়ে গেল অতি সাংঘাতিক এক লড়াই। লোকটা এতই বলবান আর ভীষণ প্রকৃতির যে বার বার আমাদের চারজনকেই গা ঝেড়ে ফেলে দিল অবলীলাক্রমে। মৃগী রোগাক্রান্ত পুরুষের মতোই খেচুনিযুক্ত অসম্ভব শক্তি তার দেহে। ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে জোর করে গলতে গিয়ে

বীভৎসভাবে কেটে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে মুখ আর হাত—কিন্তু ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়া সত্ত্বেও তিলমাত্র হ্রাস পাচ্ছে না প্রতিরোধ শক্তি। শেষকালে গলন্ধর ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে লেসট্রেড তার গলা টিপে ধরে জিভ বার করে ফেলতেই চৈতন্য হল–বুঝল বৃথা চেষ্টা। তা সত্ত্বেও দুটো হাত আর দুটো পা আচ্ছা করে না-বাঁধা পর্যন্ত নিরাপদ বোধ করলাম না কেউ। তারপর প্রায় দম আটকানো অবস্থায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম চারজনে।

স্মিত মুখে শার্লক হোমস বললে, ওর গাড়িতেই ওকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া যাবেখন। জেন্টলমেন, এবার কিন্তু ছোট্ট এই রহস্য-উপাখ্যানের অন্তে পৌঁছেছি। এখন যা খুশি প্রশ্ন করতে পারেন–উত্তর দিতে আর বাধা নেই।

দ্বিতীয় খণ্ড

সন্তদের সেই দেশটি

সুবিশাল ক্ষার সমতটে

সুবৃহৎ উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটা অনুর্বর আর বীভৎস মরুভূমি আছে। সভ্যতার অগ্রগতি বহু বছর ধরে সেখানে ঠোক্কর খেয়ে আটকে গিয়েছে। সিয়েরা নেভাদা থেকে নেব্রাস্কা আর উত্তরের ইয়োলোস্টোন নদী থেকে দক্ষিণের কলোরাডো পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ঊষর-অঞ্চলে বিরাজ করছে কেবল কবরের নীরবতা। বিকট এই মরুভূমির সর্বত্র একরূপে বিরাজিত নয় প্রকৃতি। কোথাও বরফ মুকুট পরা মেঘালয় পর্বতমালা। কোথাও অন্ধকার মৃত্যু-বিষাদে টংকারময় ধু-ধু উপত্যকা। খাঁজকাটা কিরিচের মতো গভীর গিরিখাদ ভেদ করে কোথাও বজ্র-গর্জনে প্রবাহিত দ্রুতগতি স্রোতস্বিনী, কোথাও দিগন্ত-বিসারী প্রান্তর শীতকালে শ্বেতবর্ণ ধারণ করেছে বরফের চাদরে, গ্রীষ্মকালে ধূসরাভ হয়েছে লাবণিক ক্ষারের ধুলোয়। সব কিছুর সংমিশ্রণ প্রতিক্রিয়া কিন্তু একটাই–যুগ যুগ ধরে অনুর্বরতা, অতিথিবিমুখতা আর দারুণ দুর্বিপাককে জিইয়ে রেখে পুরো অঞ্চলটিকে অনধিগম্য রাখা।

নিরাশার এই দেশে বাসিন্দা কেউ নেই। কিছু কিছু পনি আর ব্ল্যাক ফিট মাঝে মাঝে অন্য জমিতে চরতে এদিকে আসে বটে, কিন্তু দুরন্ত সাহসীরাও বুক কাঁপানো এই

প্রান্তরের সীমানা ছাড়িয়ে আসতে পারলে খুশি হয় এবং নিজেদের তৃণভূমিতে ফিরে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ছোটো ছোটো ফাঁকা ফাঁকা গাছ আর ঝোঁপের মধ্যে হিলহিলে দেহে নিঃশব্দে সঞ্চরণ করে কেবল নেকড়ে, বড়ো বড়ো ডানার লম্বা লম্বা ঝাঁপটায় বাতাস চঞ্চল করে ওড়ে বুজার্ড শকুন, আর গভীর সংকীর্ণ গিরিসংকটে হেলেদুলে টহলদার বিরাটদেহী বিরাটকার ধূসর গ্রিজলি ভালুকরা যা পায় তাই খুঁটে খায়। এরাই এই বিজন্মভূমির একমাত্র অধিবাসী।

সিয়েরা ব্লাঙ্কোর উত্তর সানুপ্রদেশ থেকে যে-দৃশ্য চোখে পড়ে, তার চেয়ে নিরানন্দ বিষণ্ণ দৃশ্যপট আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। বিস্তীর্ণ চ্যাটালো প্রান্তরের যতদূর পর্যন্ত চোখ যাবে, দেখা যাবে কদাকার জড়পিণ্ডের মতো তাল তাল বামনাকার চ্যাপারাল ঝোপ–সব কিছুর ওপর ছোপ ছোপ ক্ষার ধুলোর দাগ। দিগন্ত যেখানে শেষ, সেই প্রত্যন্ত প্রদেশে বরফ ছাওয়া। খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চুড়া। সুবিশাল এই তেপান্তরের মাঠে জীবনের চিহ্ন নেই, জীবন পদবাচ্য কোনো কিছুর লক্ষণ নেই। ইস্পাত নীল স্বর্গে নেই কোনো বিহঙ্গম, ধূসর ম্যাটমেটে মর্তে নেই কোনো সঞ্চরণ, সব কিছুর ওপর রয়েছে কেবল অখণ্ড নৈঃশব্দ। কান পেতে শুনলেও অদ্ভুত সেই বিজন প্রদেশে ক্ষীণতম শব্দটিও ভেসে আসে না করন্ধ্রে, নৈঃশব্দ ছাড়া কিছু নেই–পরিপূর্ণ এবং রক্ত জল করা নৈঃশব্দ্য।

বিশাল এই প্রান্তরে জীবন পদবাচ্য কিছু নেই আগে বলা হয়েছে। কথাটা পুরো সত্য নয়। সিয়েরা ব্লাঙ্কোর ওপর থেকে দেখা যায় একটা সরু পথ মরুভূমির মধ্যে ঢুকে এঁকেবেঁকে অনেক দূর গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে শেষকালে। এ-পথ সৃষ্টি হয়েছে গাড়ির চাকার দাগ আর বহু দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পদক্ষেপে। মাঝে মাঝে দেখা যায় সূর্যের

আলোয় কী যেন ঝকঝক করছে ধূসর লাবণিক ক্ষারপের মধ্যে অতি প্রকট হয়ে রয়েছে। কাছে যান, দেখুন কী জিনিস। হাড় : কিছু বড়ো এবং ভুল কিছু ছোটো এবং সূক্ষ্ম। বড়ো অস্থি বলদের, ছোটো অস্থি মানুষের। পনেরো মাইল পর্যন্ত এই বিকট অস্থিযুপ চোখে পড়বেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। গাড়ি নিয়ে মরু অভিযাত্রীদের পথটিও চেনা যাবে। এই পথে চলতে চলতেই পূর্ববর্তীরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে পথের পাশে।

আঠারো-শো সাতচল্লিশ সালের চৌঠা মে হৃৎকম্পকারী এই ভয়াবহ দৃশ্যের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল নিঃসঙ্গ একজন পর্যটক। আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে হয় সে ধীমান-শ্রেষ্ঠ পুরুষ, নয়তো পাণ্ডববর্জিত এই অঞ্চলের কোনো দানব। সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেও বলা শক্ত বয়সটা চল্লিশের কাছে, না ষাটের কাছে। মুখ শীর্ণ এবং উদ্রান্ত। বাদামি পার্চমেন্ট-সদৃশ্য চামড়া চেপে বসে আছে ঠেলে বেরিয়ে আসা হাড়ের ওপর; দীর্ঘ বাদামি চুল আর দাড়ির মধ্যে উঁকি দিচ্ছে পাকাচুলের শুভ্র রেখা। দুই চক্ষু কোটরাপ্রবিষ্ট কিন্তু জ্বলন্ত, অস্বাভাবিক দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল; যে-হাতে রাইফেল আঁকড়ে আছে সেটি কঙ্কাল দেহের চাইতে বেশি মাংসল নয়। সে দাঁড়িয়ে আছে আগ্নেয়াস্ত্রের ওপর ভর দিয়ে, যষ্টি ছাড়া দাঁড়াবার ক্ষমতা যেন নেই–তা সত্ত্বেও তার চওড়া হাড়ের বিপুল কাঠামো আর দীর্ঘ দেহের মধ্যে প্রকট হয়েছে তারের মতো মাংসপেশিবহুল প্রচণ্ড গড়ন পেটন। কৃশ মুখ আর শুষ্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর থলির মতো চাপানো ভিন্ন পরিধেয়র মধ্যেই অবশ্য সুস্পষ্ট হয়েছে তার জরাগ্রস্ত এবং বুড়োটে আকৃতি। লোকটা মরতে চলেছে–ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায়।

অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে অতি কষ্টে গিরিসংকট পেরিয়ে সে এই উচ্চতায় আরোহণ করেছিল জল পাওয়ার বৃথা আশায়। কিন্তু এখন তার চোখে বিস্তৃত সুবিশাল লাবণিক প্রান্তর, বর্বর পর্বতমালার দূরবর্তী বলয় গাছপালা আগাছা ঝোঁপের চিহ্নমাত্র নেই কোথাও, নেই আর্দ্রতার ক্ষীণতম আভাস। বিশাল এই নিসর্গ দৃশ্যে আশার তিলমাত্র ঝলকও নেই কোথাও। বন্য জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে বার বার সে তাকিয়েছে উত্তরে এবং পূর্বে এবং পশ্চিমে বারংবার এসেছে সেই একই উপলব্ধি : পর্যটন অন্তে পৌঁচেছে এবড়োখেবড়ো এই খাড়া পাহাড়েই মরতে হবে তাকে। একটা বিরাট আলগা পাথরের ছায়ায় বসে বিড়বিড় করে বললে নিজের মনে–মন্দ কী! আরও বিশ বছর পরে তুলোর বিছানায় মৃত্যুর বদলে না হয় এই মৃত্যুকেই বরণ করা যাক হাসিমুখে।

পাথরের ছায়ায় বসবার আগে সে অকেজো রাইফেলের বোঝা নামিয়ে রাখল পায়ের কাছে, সেইসঙ্গে ডান কাঁধে ঝোলানো ধূসর শালকাপড়ের একটা মস্ত পুটুলি। কাহিল শরীরের পক্ষে পুঁটুলিটা নিশ্চয় অতিরিক্ত ভারী, কেননা কাঁধ থেকে নামানোর সময়ে তা দমাস করে খসে পড়ল জমির ওপর। সঙ্গেসঙ্গে ধূসর পুলিন্দার মধ্যে থেকে ভেসে এল সরু গলায় গোঙানি, ঠেলে বেরিয়ে এল অতিশয় উজ্জ্বল বাদামি চোখ সমন্বিত একটা ছোট্ট ভয়ার্ত মুখ এবং ডোরাকাটা টোল খাওয়া একজোড়া খুদে মুষ্টি।

কচি গলায় জাগ্রত হল ভৎসনা—

উঃ! বড্ড লেগেছে!

ইচ্ছে করে লাগাইনি রে! অনুতপ্ত সুরে বলল লোকটা! বলতে বলতে ধূসর শালের ভাঁজ খুলে বাইরে টেনে আনল বছর পাঁচেকের ভারি মিষ্টি চেহারার ছোট্ট একটি মেয়েকে : সূক্ষ্ম রুচিসম্পন্ন পরিপাটি জুতো, স্মার্ট গোলাপি ফ্রকের ওপর পুঁচকে অ্যাপ্রনের মধ্যে রয়েছে মাতৃস্নেহের সুকোমল নিদর্শন। অবসন্ন পার হলেও মেয়েটির হাত পায়ের লাবণ্য দেখে বোঝা যায় সঙ্গী পুরুষের মতো ধকল তাকে সইতে হয়নি।

এখন কীরকম বুঝছিস? উদবিগ্ন স্বরে শুধোয় লোকটি। কেননা মেয়েটি তখনও হাত বুলোচ্ছে মাথার পেছনে দড়ির মতো গুচ্ছ পাকানো সোনালি চুলের রাশিতে।

চুম দাও, তাহলেই সেরে যাবে। অতীব গম্ভীর মুখে আহত জায়গাটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে খুদে মেয়ে, মা-ও তাই করত। মা কোথায়?

চলে গেছে। শিগগিরই দেখা হবে মনে হয় তোর সঙ্গে।

চলে গেছে! কী আশ্চর্য। যাবার সময়ে আসছি বলে গেল না। মাসিমার কাছে চা খেতে গেলেও বলে আসছি আর আজকে নিয়ে তিন দিন হল মা কোথায় গেছে। বড্ড শুকনো জায়গা তো। জলটল নেই? খাবার?

কিছুই নেই মা। একটু ধৈর্য ধর, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কাঁধে এইভাবে মাথাটা রাখ, গায়ে জোর পাবি, ঠোঁট শুকিয়ে শুকনো চামড়ার মতো হলে কথা বলা যায় না, তাহলেও তোকে সব বলব। হাতে কী রে?

কী সুন্দর জিনিস। কী ভালোই না লাগছে দেখতে! সোৎসাহে দু-টুকরো চকচকে অভ্র তুলে দেখিয়ে বলল মেয়েটি, বাড়ি গিয়ে বব-ভাইকে দোব।

এর চাইতে ভালো জিনিস শিগগিরই দেখতে পাবি মা, প্রত্যয়ের সুরে বললে লোকটা! একটু অপেক্ষা কর। তার আগেই অবশ্য সব বলছি–নদী ছাড়িয়ে এলাম কখন মনে আছে তো?

হ্যাঁ, আছে।

তখন ভেবেছিলাম শিগগির আর একটা নদী পেয়ে যাব। কিন্তু কম্পাস অথবা ম্যাপে কোথাও একটা ভুল ছিল। নদী আর পেলাম না। জল ফুরিয়ে গেল। তোর জন্যে রইল শুধু কয়েক ফোঁটা। তারপর... তারপর...

চান করবার জল আর পেলে না, তাই তো? গম্ভীরভাবে সঙ্গী পুরুষের ধূলিধূসরিত আকৃতির পানে তাকিয়ে বললে মেয়েটি।

খাবার জলও পেলাম না। তাই প্রথমেই গেলেন মি. বেনডার, তারপরে মিসেস ম্যাকগ্রেগর, তারপর জনি হোন্স, তারপরে তোর মা।

তাহলে মা-ও মরে গেছে, ফ্রকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে মেয়েটি।

হ্যাঁ, মা। সবাই গেছে, তুই আর আমি বাদে। তখন ভাবলাম এদিকে এলে হয়তো জল পাব। কাঁধে ঝুলিয়ে নিলাম তোকে অনেক কষ্টে এলাম বটে কিন্তু জল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বাঁচবার সম্ভাবনা বিশেষ নেই।

তাহলে কি আমরাও মরে যাব? কান্না থামিয়ে অশ্রু আঁকা মুখ তুলে শুধোয় মেয়েটি।

হ্যাঁ, মা, সেইরকমই মনে হচ্ছে।

আগে বলোনি কেন? হাসিতে কলকলিয়ে ওঠে খুদে পরি। এমন ভয় দেখাচ্ছিলে। মরলেই তো মায়ের কাছে যাব।

তা যাবি।

তুমিও যাবে। মাকে বলবখন আমার জন্যে তুমি কত কী করেছ। দেখবে, স্বর্গের দরজায় এক জগ জল আর এক ঝুড়ি কেক নিয়ে মা দাঁড়িয়ে থাকবে। দু-দিক সেঁকা কেক–আমি আর বব যা খেতে ভালোবাসি। আর কত দেরি?

জানি না–খুব দেরি নেই মনে হচ্ছে। উত্তর দিগন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললে লোকটা। স্বর্গের নীল খিলেনে তিনটে বিন্দু দেখা দিয়েছে এবং প্রতি মুহূর্তে আকারে বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসার দরুন। দেখতে দেখতে কাছে এসে গেল কালো বিন্দু তিনটি।

দেখা গেল তিনটে বিশাল বাদামি পাখি অভিযাত্রীদের মাথার ওপর চক্রাকারে পাক দিয়ে গিয়ে বসল অদূরে উঁচু পাথরে–নজর রইল কিন্তু এদের দিকেই। পাখিগুলো বুজার্ড শকুন–এরা আসা মানেই বুঝতে হবে মৃত্যুও আসছে।

কদাকার পাখিগুলো দেখিয়ে ফুর্তি উচ্ছল কণ্ঠে বললে মেয়েটা, মুরগি না মোরগ? ভগবান কি এ-দেশটাও তৈরি করেছে?

করেছে বই কী, অপ্রত্যাশিত এই প্রশ্নে চমকে গিয়ে বলে লোকটি।

ভগবান ইলিনয় তৈরি করেছে, মিসৌরী তৈরি করেছে। আমার মনে হয় এই দেশটা অন্য কেউ তৈরি করেছে। মোটে ভালো হয়নি। জল দিতে ভুলে গেছে, গাছ বানাতে ভুল গেছে।

ভগবানকে ডাকলে হয় না?

এখনও রাত হয়নি।

তাতে কিছু এসে যাবে না। অসময়ে প্রার্থনা করলেও ভগবান কিছু মনে করবে না। প্রান্তর পেরিয়ে আসার সময়ে তুই তো রোজ রাত্রে গাড়ির মধ্যে প্রার্থনা করতিস।

তুমি করো না।

মনে থাকলে তো করব। সব ভুলে গেছি। ভগবানকে ডাকবার সময়ও পাইনি, যা কষ্ট গেছে। তুই বল। আমি শেষের দিকে গলা মিলাব।

তাহলে আমার মতো তোমাকেও হাঁটু গেড়ে এইভাবে বসতে হবে, শালটা জমির ওপর বিছোতে বিছোতে বলে মেয়েটা। দু-হাত রাখবে এইভাবে। খুব ভালো লাগবে।

অদ্ভুত সেই দৃশ্য দেখবার জন্যে বুজার্ড শকুন ছাড়া আর কেউ ছিল না সেখানে। সরু শালের ওপর পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসেছে দু-জন ভ্রামণিক একজন একটা পুঁচকে বাচাল শিশু, আর একজন বেপরোয়া পোড় খাওয়া দুঃসাহসী। একজনের মুখ চাব মাছের মতো গোলগাল আর একজনের মুখ ঝড়োকাকের মতো মোটা মোটা হাড়গুলোই কেবল ঠেলে আছে–মাংস তেমন নেই। দুটো মুখই উথিত নির্মেঘ সুনীল স্বর্গ অভিমুখে বীভৎস পরিণতির সম্মুখীন হওয়ায় আন্তরিক অনুনয় পরিস্ফুট দুটি মুখেই সম্মিলিত কণ্ঠেও ধ্বনিত হচ্ছে সেই অনুনয়–সরু আর স্পষ্ট, গভীর আর রুক্ষ। দুটো গলার অন্তর থেকে ক্ষমা আর করুণা প্রার্থী দুটি অসহায় প্রাণী। প্রার্থনা শেষ হল। রক্ষকের প্রশস্ত বুকে মাথা রেখে পাথরের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ল বাচ্চা। ঘুমন্ত শিশুর দিকে কিছুক্ষণ অনিমেষে চেয়ে রইল রক্ষক। কিন্তু প্রস্তুতির ডাক আর এড়াতে পারল না। তিন দিন তিন রাত সে ঘুমোয়নি, জিরোয়নি। ক্লান্ত চক্ষুর ওপর আস্তে আস্তে নেমে এল চোখের পাতা, একটু একটু করে মাথা ঝুলে এল বুকের ওপর। তারপর এক সময়ে তার ধূসরবর্ণ দাড়ির জট একাকার হয়ে মিশে গেল শিশুর স্বর্ণবর্ণ আলোকগুচ্ছের সাথে। স্বপ্নহীন সুগভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল দু-জনেই।

পুরুষ ভ্রামণিক আরও আধঘণ্টা জাগ্রত থাকলে দেখতে পেত অদ্ভুত একটা দৃশ্য। ক্ষারপ্রান্তরের প্রত্যন্ত কিনারায় অনেক দূরে ধুলো ছিটিয়ে উঠল অতি সামান্য। প্রথমে খুবই অল্প। দূরের কুহেলি থেকে তা আলাদা করা যায় না। কিন্তু একটু একটু করে উপরে উঠে ছড়িয়ে পড়ল ধুলোর ফোয়ারা–আস্তে আস্তে রূপ নিল মেঘের। ধুলোর মেঘ। স্পষ্ট, নিরেট ধুলোর মেঘ। ক্রমশ বেড়েই চলল মেঘের আকার। শেষকালে যে-আকারে পৌঁছোল তাতে স্পষ্ট বো‌েঝা গেল অগুনতি প্রাণীর পদক্ষেপের ফলেই সৃষ্টি এই ধূলি মেঘের। উর্বর জায়গা হলে মনে হত তৃণভূমিতে চরতে বেরিয়েছে পালে পালে বাইসন মোষ। কিন্তু এই অনুর্বর অঞ্চলে তা একেবারেই অসম্ভব। সমাজচ্যুত এই দুটি প্রাণী যে নিঃসঙ্গ খাড়া পাহাড়ের গায়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, ধুলোর ঘূর্ণিমুখ সেইদিকে আরও এগিয়ে আসার পর ঝটিকার মধ্যে একটু একটু করে উঁকি দিল ক্যানভাস-ছাওয়া ঘোড়ায় টানা গাড়ির শীর্ষদেশ এবং সশস্ত্র ঘোড়সওয়ারদের মূর্তি। প্রেতচ্ছায়ার মতো সেই দৃশ্য আরও স্পষ্ট হল। মরুযাত্রীদের একটা বিরাট দল চলেছে বসবাসের উপর্যুক্ত ঢাকা ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে। চলেছে পশ্চিমদিকে। কী বিরাট সেই দল! সামনের গাড়িগুলো পাহাড়ের সন্নিদেশে পৌঁছে গেলেও পেছন দিক তখনও অদৃশ্য রইল দূরদিগন্তে। বিপুল মরুপ্রান্তরের ওপর বিস্তৃত রইল কেবল ঢাকা গাড়ি আর খোলা গাড়ি, ঘোড়ার পিঠে পুরুষ, পায়ে হাঁটা পুরুষ। অগণিত মেয়ে পিঠে বোঝা নিয়ে নুয়ে পড়ে ছুটছে গাড়ির পাশে পাশে। বাচ্চারাও পাশে, সাদা আবরণ সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে গাড়ির ভেতরে। সাধারণ আদিবাসী এরা নয়, বিশেষ ধরনের যাযাবর মানুষ অবস্থায় চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে নতুন দেশের সন্ধানে বেরিয়েছে। বাতাসে ভাসছে অনেকরকম আওয়াজের মিশ্রিত কোলাহল। গাড়ির চাকার গড়গড়ানি, বহু মানুষের একটা চাপা গুমগুম আওয়াজ, তৈলহীন চাকার

ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ আর অগুনতি ঘোড়ার হেষারব। এত আওয়াজেও কিন্তু পথ শ্রান্ত দুই অভিযাত্রীর ঘুম ভাঙল না খাড়া পাহাড়ের গায়ে।

মরুযাত্রীদের পুরোভাগে জনাবিশেক অশ্বারোহী আসছে। গম্ভীর আর লোহার মতো শক্ত মুখ প্রত্যেকের। পরনে সাদাসিদে হাতে বোনা পোশাক। কাঁধে রাইফেল। খাড়া পাহাড়ের তলদেশে এসে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে যুক্তি পরামর্শ শুরু করল নিজেদের মধ্যে।

চুল যার ধূসর, গোঁফদাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো, ঠোঁট কঠিন–সে বললে, ব্রাদার, কুয়োগুলো কিন্তু ডান দিকে।

আরেকজন বললে, সিয়েরা ব্লানকোর ডান দিকে–তাহলেই পৌছাবো রিও গ্রান্ডি।

জলের জন্যে ঘাবড়িয়ো না, চিৎকার শোনা গেল তৃতীয় কণ্ঠে।পাথর ছুঁড়ে যিনি ফোয়ারা বার করতে পারেন, এ দুঃসময়ে মুখ তুলে তিনি চাইবেনই, আমরা যে তার নির্বাচিত সন্তান।

তাই হোক! তাই হোক! সম্মিলিত কণ্ঠে সাড়া দিল পুরো দলটা।

এই বলে ফের যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছে মরুযাত্রীদের পুরোধাগণ, এমন সময়ে খোঁচা খোঁচা খাড়াই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন। চোখ তার সবচেয়ে তীক্ষ্ণ, বয়স সবচেয়ে কম। তাই সে দেখতে পেয়েছে অনেক উঁচুতে ধূসর

কঠিন পাথরের পটভূমিকায় সামান্য একটু গোলাপি রং। হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে জিনিসটা। ধূসর পাহাড়ের গায়ে বড়ো উজ্জ্বলভাবে দেখাচ্ছে গোলাপি গুচ্ছ। দৃশ্যটা চোখে পড়ার সঙ্গেসঙ্গে লাগাম টেনে দাঁড়িয়ে গেল প্রত্যেকে, কাঁধের রাইফেল চলে এল হাতে, পেছন থেকে আরও সশস্ত্র ঘোড়সওয়ার ছুটে এল পুরোধাদের বলীয়ান করতে। মুখে মুখে শোনা গেল একটাই শব্দ–লাল চামড়া।

দলপতি বলে যাকে মনে হল, তার বয়স হয়েছে। বললেন, ইন্ডিয়ানরা এখানে সংখ্যায় বেশি নেই। পনিদের পেরিয়ে এসেছি। বড়ো পাহাড় না-আসা পর্যন্ত আদিবাসীদের তো আর দেখা যাবে না।

একজন বললে, ব্রাদার স্টানজারসন, গিয়ে দেখে আসব?

আমি যাব, আমি যাব, চেঁচিয়ে উঠল ডজনখানেক কণ্ঠ।

বয়স্ক ব্যক্তি বললেন, ঘোড়া রেখে যাও। তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে, পাথরের গায়ে লাগাম বেঁধে তরুণ যাযাবররা খাড়াই পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল কৌতূহল মিটোনোর অভিলাষে। উঠতে লাগল নিঃশব্দে দ্রুতবেগে, অত্যন্ত স্কাউটের দক্ষতা আর আত্মবিশ্বাস নিয়ে। নীচ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে সঙ্গীরা দেখলে পাথর থেকে পাথরের গায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে তরুণ দল। দেখতে দেখতে যেন আকাশের কাছে পৌঁছে গেল দেহরেখাগুলো। গোলাপিগুচ্ছ দেখে প্রথমে যে চেঁচিয়েছিল, পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সেই তরুণটি। অনুবর্তী সঙ্গীরা অবাক হল হঠাৎ তার সবিস্ময়ে শূন্যে দু-হাত নিক্ষেপ

দেখে। কাছে যাওয়ার পর কিন্তু প্রত্যেকেই একইভাবে দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে লাফিয়ে উঠল প্রচণ্ড বিস্ময়ে। দেখল সেই একই দৃশ্য।

ন্যাড়া পাহাড়ের মাথাটা চ্যাটালো। ছোট্ট উপত্যকার মাঝে একটিমাত্র দানবিক পাথর। পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে এলিয়ে রয়েছে দীর্ঘকায় এক পুরুষ, দাড়ি বেশ লম্বা, রুক্ষ কদাকার মূর্তি, কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় বিশীর্ণ। প্রশান্ত মুখে ঘুমোচ্ছে সে, নিশেস পড়ছে নিয়মিত ছন্দে। পাশেই ঘুমোচ্ছে একটি শিশু। সুগোল, সাদা হাতে জড়িয়ে রয়েছে পুরুষ-সঙ্গীর সিটে-মারা শক্ত বাদামি ঘাড়, স্বর্ণকেশ মাথাটি ন্যস্ত বুকের মখমল-পোশাকে। দ্বিধাবিভক্ত গোলাপি অধরোষ্ঠের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাদা দাঁতের সুসম সারি, শিশুমুখে ভাসছে বড়ো ফুর্তির হাসি যেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও সে খেলায় মত্ত। ছোট্ট ফুলো পা দুটিতে সাদা মোজা, পরিচ্ছন্ন জুতোয় চকচকে বাক। সঙ্গীর দীর্ঘ শুকনো কুঁচকোনো হাত-পায়ের পাশে সে-দৃশ্য বড়োই বেমানান। বিরাট পাথরটার ওপরের কিনারায় নীরবে বসে তিনটে বুজার্ড শকুনি একদৃষ্টে চেয়ে ছিল ঘুমন্ত এই দুই মূর্তির পানে। আগন্তুকদের দেখে কর্কশ নৈরাশ্য চিৎকারে বাতাস ফালাফালা করে ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল দিগন্তে।

বিকট পক্ষীদের রক্ত-জল-করা ওই চিৎকারেই ঘুম ভেঙে গেল ঘুমন্ত দু-জনের। ফ্যালফ্যাল করে হতভম্ব মুখে চাইল চারদিকে। পুরুষটি টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু প্রান্তরের দিকে। ঘুমের আগে এই প্রান্তর ছিল নিষ্প্রাণ, নিথর নির্জন। এখন সেখানে পিলপিল করছে মানুষ আর পশু। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না লোকটা, বিষম অবিশ্বাস ফুটে উঠল চোখে-মুখে, শিরা-বার-করা

দু-হাত দিয়ে রগড়ে নিল দু-চোখ। বললে বিড়বিড় কণ্ঠে এরই নাম হল মতিভ্রম। কোট খামচে ধরে পাশেই দাঁড়িয়ে বাচ্চা মেয়েটি। মুখে কথা নেই, কিন্তু শিশুসুলভ সপ্রশ্ন চোখে অবাক হয়ে দেখছে আশেপাশের দৃশ্য।

উদ্ধারকারী দলটি অবশ্য অচিরেই সমাজচ্যুত দু-জনকে বুঝিয়ে দিলে স্বপ্ন দৃশ্য নয়, মতিভ্রম নয়, সত্যি ওরা রক্তমাংসের মানুষ। একজন মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিলে, দু-জন বিশীর্ণ কাহিল লোকটিকে দু-পাশ থেকে ধরে নিয়ে চলল নীচে ঘোড়ার গাড়ির দিকে।

যেতে যেতে বললে লোকটা, আমার নাম জন ফেরিয়ার। একুশজনের মধ্যে বেঁচে আছি। কেবল আমি আর ওই বাচ্চা মেয়েটা। খিদে তেষ্টায় মরেছে প্রত্যেকে দক্ষিণ অঞ্চলে।

তোমার বাচ্চা? শুধোয় একজন।

এখন থেকে তাই, জন ফেরিয়ার বললে বেপরোয়া কণ্ঠে। ওকে আমি বাঁচিয়েছি, তাই ও আমারই মেয়ে। থাকবে আমারই কোলে–ছিনিয়ে নিতে দেব না কাউকে। আজ থেকে ওর নাম লুসি ফেরিয়ার। কিন্তু তোমরা কে? সকৌতূহলে রৌদ্রদগ্ধ দীর্ঘকায় সুঠামদেহী উদ্ধারকারীদের দিকে তাকিয়ে শুধোয় জন–তোমরা দেখছি দলে বেশ ভারী।

প্রায় দশ হাজার। ঈশ্বরে নিগৃহীত সন্তান আমরা অ্যাঞ্জেল মেরোনার ধর্মে দীক্ষিত।

নাম শুনিনি কখনো। তবে চ্যালাচামুণ্ডা জুটিয়েছে ভালো।

ইস্পাত-কঠিন কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল একজন তরুণ, পবিত্র প্রসঙ্গ নিয়ে রঙ্গ পরিহাস–করলেই খুশি হব। পালমিরার ধর্মপ্রাণ জোসেফ স্মিথকে একটা পেটাই সোনার পাত দেওয়া হয়েছিল। মিশরীয় হরফে তাতে যে-বাণী উৎকীর্ণ ছিল, আমরা তার প্রতিটি অক্ষর মেনে চলি। বেদবাক্যের মতোই তা পবিত্র আমাদের কাছে। আমরা আসছি ইলিনয় প্রদেশের নভু অঞ্চল থেকে মন্দির প্রতিষ্ঠাও করেছি সেখানে। ঈশ্বর প্রসাদে বঞ্চিত অত্যন্ত উগ্র প্রকৃতির এক ব্যক্তির অত্যাচারে আমরা দেশ-ছাড়া হয়ে খুঁজছি এমন একটা দেশ যেখানে উগ্রতা নেই, বর্বরতা নেই–সে-দেশ মরুভূমির মাঝে হলেও আপত্তি নেই।

নভু নামটা ঘা দিয়েছিল জন ফেরিয়ারের স্মৃতির তন্ত্রীতে। বললে, তাই বলো। তোমরা মর্মোন।

হ্যাঁ, আমরা মর্মোন, একবাক্যে একসঙ্গে বলে উঠল সবকটি তরুণ।

যাচ্ছ কোথায়?

জানি না। ঈশ্বর আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন অবতারের মাধ্যমে। আমাদের সঙ্গে চলেছেন অবতার। তোমাকেও যেতে হবে তার সামনে। তিনিই ব্যবস্থা দেবেন তোমার ব্যাপারে!

এসে গেছে সানুদেশ। ঘিরে ধরেছে তীর্থযাত্রীরা; ফ্যাকাশে মুখ, বিনম্র স্ত্রীলোক। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হাস্যমুখের ছেলে-মেয়ে; উদবিগ্ন, ব্যগ্র-চক্ষু পুরুষ। একজনের কচি বয়স আর একজনের দুরবস্থা দেখে আহা আহা সহানুভূতিতে বাতাস মুখরিত। উদ্ধারকারীরা ঠেলেঠুলে এদের মাঝ দিয়ে দুজনকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ছিমছাম চেহারার একটা বড়ো আকারের গাড়ির সামনে। বেশ সাজানো ওয়াগন। অন্যান্য ওয়াগনে দুটো কি চারটে ঘোড়া, কিন্তু বিশেষ এই ওয়াগনটি টানছে ছ-টি ঘোড়া। চালকের পাশে আসীন পুরুষটি বয়সের দিক দিয়ে বড়োজোর তিরিশ হলেও প্রকাণ্ড মাথা আর দৃঢ় মুখচ্ছবি দেখে নেতা বলেই মনে হয়। বাদামি মলাট দেওয়া বই পড়ছিল পুরুষটি। এরা গিয়ে দাঁড়াতে বই নামিয়ে মন দিয়ে শুনল সব কথা। তারপর চোখ তুলল সমাজচ্যুত দু-জনের দিকে।

বললে, ধীর, গম্ভীর, শান্ত গলায়, আমার সঙ্গে আসতে হলে আমরা যে-ধর্মে বিশ্বাসী, সেই বিশ্বাস আনতে হবে। নেকড়ের সঙ্গে পথ চলতে আমরা চাই না। ছোট্ট পোকাই শেষ পর্যন্ত পচন ধরায় গোটা ফলে। তার চাইতে তোমাদের হাড় মরুভূমিতে ফেলে যেতেও আমরা তৈরি এই শর্তে যদি আসতে চাও আসতে পার।

যেকোনো শর্তেই আসতে রাজি, প্রাণঢালা আবেগে বলল জন ফেরিয়ার। মুচকি হাসল বয়স্কা। অবিচল রইল নেতার নির্বিকার, কঠোর মুখভাব।

বলল, ব্রাদার স্ট্যানজারসন, সঙ্গে নাও এদের! খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করো–বাচ্চাটাকে দেখো। পবিত্র ধর্মতত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়ে অবসর মতো। আর দেরি নয়। চলো এগিয়ে চলো জিয়ন!

চলো জিয়ন! গলা মিলিয়ে হাঁক দিল মর্মোনরা। মুখে মুখে ফিরতে লাগল সেই ডাক–চলো জিয়ন! চলো জিয়ন! চলো জিয়ন! দূর হতে দূরে ছড়িয়ে গেল সেই হাঁক আস্তে আস্তে ক্ষীণ গুঞ্জন ধ্বনির মতো মিলিয়ে গেল দূর দিগন্তে। চাবুকের সপাং সপাং আওয়াজ আর ক্যাঁচ ক্যাঁচ চক্রধ্বনির মধ্যে দিয়ে নতুন করে শুরু হল বিরাট বিরাট ওয়াগনগুলোর পথ চলা। দেখতে দেখতে বিশাল ক্যারাভানটা সর্পিল ভঙ্গিমায় এগিয়ে চলল মরুপথ বেয়ে। নবাগত দু-জনকে এক ওয়াগনে নিয়ে এল একজন বয়স্ক পুরুষ পরিচর্যার ভার পড়েছে এর ওপরেই। এসে দেখল খাবার তৈরি।

বলল, এখানেই থাক এখন। দু-দিনেই ক্লান্তি কেটে যাবে। কিন্তু মনে রেখো, এই মুহূর্ত থেকে তুমি আমাদের একজন একই ধর্মে বিশ্বাসী। ব্রিগহ্যাম ইয়ং যা বলেছেন, তার নিজের কথা নয়–জোসেফ স্মিথের কণ্ঠে বললেন স্বয়ং ঈশ্বর।

উটার ফুল

স্বদেশ ত্যাগ করে কত কষ্ট সয়ে নতুন দেশে শেষ পর্যন্ত আশ্রয় খুঁজে পেল মর্মোনরা, সেকাহিনি বলবার জায়গা এটা নয়। মিসিসিপি উপকূল থেকে শুরু করে রকি মাউন্টেনের ঢাল পর্যন্ত ওরা যে-জেদ নিয়ে এগিয়েছে, ইতিহাসে তার সমতুল্য নজির আর নেই বললেই চলে। প্রকৃতি যতরকম অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে, মর্মোনদের সামনে উপস্থিত হয়েছিল তার প্রতিটি। বর্বর মানুষ, হিংস্র শ্বাপদ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, ব্যাধি–সবকটিই এসেছে ওদের শেষ করতে কিন্তু পারেনি। গোঁয়ার অ্যাংলো-স্যাক্সনদের মতোই সব বাধা পেরিয়ে এসেছে ওরা প্রচণ্ড জেদকে সম্বল করে। তা সত্ত্বেও বলিষ্ঠতম মর্মোনদেরও বুক কেঁপেছে বহুবার সুদীর্ঘ যাত্রাপথ এবং অসংখ্য আতঙ্কের মাঝে। তাই যেদিন রৌদ্রালোকিত উটা উপত্যকা ভেসে উঠল ওদের চোখের সামনে, সেদিন নতজানু হয়ে বসে সবাই প্রাণঢালা প্রার্থনা জানালে ঈশ্বরকে যে দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এতগুলি মানুষকে অত্যাচারের আলয় থেকে মুক্তির দেশে। অবতার নিজেও বললে, এই সেই দৈবাদেশের দেশ, ঈশ্বর প্রতিশ্রুত দেশ। উর্বর এই অঞ্চল আজও কুমারী। মানুষের লাঙল স্পর্শ করেনি সেখানকার মাটি–সুজলা শ্যামলা এদেশ এখন থেকে কেবল দুঃসাহসী এই মর্মোনদেরই।

ইয়ং যে সুদক্ষ শাসনকা, তা দেখিয়ে দিলে অচিরে। দৃঢ়চেতা দলপতি হিসেবেও সে অতুলনীয়। ম্যাপ আর চার্ট তৈরি হল তৎক্ষণাৎ। আঁকা হয়ে গেল ভবিষ্যৎ শহরের নকশা। মর্যাদা অনুসারে জমিজায়গাও বিলি হয়ে গেল দু-দিনে। যে ব্যবসাদার সে পেল

ব্যবসার সুযোগ; যে কারিগর, তাকে লাগিয়ে দেওয়া হল হাতের কাজে। যেন জাদুমন্ত্রবলে রাস্তাঘাট বাগান চত্বর তৈরি হয়ে গেল শহরে। নর্দমা তৈরি, আগাছা সাফ, ঝোপঝাড়ের বেড়া, বীজ রোপণেই গেল একটা বছর। তারপর গ্রীষ্ম আসতেই সারাদেশ সোপার মতো ঝলমলিয়ে উঠল গমের চারায়। শ্রী আর সম্পদ উথলে উঠল সব কিছুর মধ্যেই। শহরের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত বিরাট মন্দিরটাও ক্রমশ আরও বিরাট, আরও লম্বা হয়ে ঠেলে উঠতে লাগল আকাশের দিকে। দ্রুতবৃদ্ধির দিক দিয়ে মন্দিরটি ছাড়িয়ে গেল বিচিত্র এই উপনিবেশের সব কিছুই। উষার প্রথম অরুণিমা থেকে গোধুলির অবসান পর্যন্ত বিরাট এই স্মৃতিসৌধের সর্বত্র শোনা যেত হাতুড়ির ঠকাঠক আর করাতির ঘস ঘস আওয়াজ। যে পরম কারুণিকের কৃপায় এতগুলি মানুষ এত বিপদ পেরিয়ে সুখের নীড় পৌঁচেছে, তার উদ্দেশে ভক্তি উজাড় করে দিত কৃতজ্ঞ অধিবাসীরা।

মহা-তীর্থযাত্রার শেষ অবধি সঙ্গে থেকেছে জন কেরিয়ার আর তার পালিত কন্যা লুসি ফেরিয়ার। ব্রাদার স্টানজারসনের ওয়াগনেই পরম সুখে দিন কাটিয়েছে লুসি সেবাযত্ন পেয়েছে স্ট্যানজারসনের তিন বউয়ের কাছে; খেলার সঙ্গীরূপে পেয়েছে স্ট্যানজারসনের বারো বছরের রগচটা, ডানপিটে পুত্রকে। বাচ্চাবয়স থেকে অনেক আঘাত, অনেক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে আসতে হয়েছে লুসিকে। মায়ের মৃত্যুর পর নতুন এই পরিবেশেও বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে। ক্যানভাস-ঢাকা এই চলন্ত বাড়ির আর এই তিন রমণীকে নিয়ে নতুন জীবনে দিব্বি মিশে গিয়েছে। জন ফেরিয়ারও প্রয়োজনীয় পথপ্রদর্শকরূপে সবার নজরে এসেছে। অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের শ্রদ্ধা ভালোবাসা কেড়ে নেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ যাত্রা শেষে সাব্যস্ত করা হল আর সবার মতো তাকেও

উর্বর জমি-জায়গা দেওয়া হবে সম-পরিমাণে। সবচেয়ে বেশি পাবে অবশ্য ইয়ং স্বয়ং আর তার চার মুখ্য বয়স্ক স্ট্যানজারসন, কেমব্যাল, জন্সটন, ড্রেবার।

নিজের জায়গায় প্রথমে একটা কাঠের গুঁড়ির কুঁড়ে তৈরি করল জন ফেরিয়ার। ক্রমে ক্রমে তাকে বড়ো করে নিজের হাতে বানিয়ে নিল আলো হাওয়া যুক্ত প্রশস্ত একটা ভিলা। মন তার বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন, হাতের কাজে দক্ষ, আচার-আচরণে আন্তরিক। লৌহ-কাঠামোর দৌলতে উদয়াস্ত পরিশ্রম তার কাছে কিছুই নয়। স্বহস্তে জমি চাষ আর জায়গা-জমির উন্নতি সাধনে ব্যয় করত সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে। দিনে দিনে তাই বেড়েই চলল তার জায়গা-জমির সম্পদ। তিন বছরে অবস্থা স্বচ্ছল হল প্রতিবেশীদের তুলনায়, ছ-বছরে হল বেশ বিত্তবান, ন-বছরে রীতিমতো ধনবান, বারো বছর পরে দেখা গেল ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বড়োলোক ছ-জনও নেই সল্টলেক সিটিতে। সুবৃহৎ মধ্যবর্তী সমুদ্র থেকে সুদূর ওয়াসাচ মাউন্টেন্স পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জন ফেরিয়ারের চাইতে অধিক পরিচিত নাম আর রইল না একটিও।

শুধু একটি ব্যাপার স্বধর্ম বিশ্বাসীদের মনে দাগা দিলে জন ফেরিয়ার। সঙ্গীসাথিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিয়ে বিয়ে থা করে সংসারী হলে খুশি হত সবাই। কিন্তু যুক্তিতর্ক অনুরোধ উপরোধ ব্যর্থ হল এই একটি ব্যাপারে। স্ত্রীলোক সংসর্গে এত অরুচি কেন, তার কারণ সে ব্যাখ্যা করেনি। কিন্তু একনাগাড়ে প্রত্যেকের কথাই পায়ে ঠেলেছে, গোঁয়ার গোবিন্দের মতো নিজের মতে অটল থেকেছে। কেউ বলেছে এ-ধর্মে ওর মতি তেমন সুদৃঢ় নয়, কেউ বলেছে পয়সা পিশাচ তো, পাছে টাকা খরচ হয় এই ভয়ে বিয়েতে নারাজ! কেউ শুনিয়েছে পুরোনো প্রেমের কল্পিত কাহিনি—প্রেমিকাটি নিশ্চয়

আটলান্টিক পাড়ের মেয়ে, শুভ্রকেশী সুন্দরী। কারণ যাই হোক না কেন, জন কেরিয়ার অবিচল থেকেছে আপন মতে। অন্যান্য সব ব্যাপারে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলেছে অক্ষরে অক্ষরে, একাত্ম হয়েছে ঔপনিবেশিকদের সঙ্গে, সুনাম কিনেছে অনমনীয় আর ঋজু মনোভাবের জন্য।

কাঠের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই বড়ো হল লুসি ফেরিয়ার। পালিত পিতাকে সাহায্য করেছে। সে প্রতিটি কাজে! পাহাড়ের শানিত হাওয়া আর পাইন গাছের স্নিগ্ধ সুগন্ধী যুগপৎ আয়া আর মা হয়ে এসেছে তার জীবনে। দিনে দিনে বড়ো হয়েছে। গাল আরও লাল হয়েছে, পদক্ষেপে শক্তি বিচ্ছুরিত হয়েছে, শরীরে স্বাস্থ্যের জোয়ার এসেছে। জন ফেরিয়ারের খামার বাড়ির পাশ দিয়ে হাইরোড বরাবর যেতে যেতে বহু পথিক তার দীর্ঘ, সুকুমারী মূর্তি দেখে উদবেলিত হয়েছে, শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে বাবার মাসট্যাঙ° ঘোড়ায় তার অনায়াস আরোহণ দেখে ফেলে আসা বিস্মৃত আবেগকে নতুন করে মনের মধ্যে অনুভব করেছে, পশ্চিমের দুর্দান্ত সন্তানের মতো অক্লেশে অথচ মনোরম ভঙ্গিমায় বুনো ঘোড়া মাসট্যাঙকে চালনার কৌশল দেখে বিস্মিত হয়েছে। এই ভাবেই একটু একটু করে কুঁড়ি ফুটে পাপড়ি মেলে ধরেছে অপরূপ একটি পুষ্প। প্রশান্তসাগরীয় অববাহিকায় ওরকম পরিপূর্ণ আমেরিকান সৌন্দর্য আর একটিও দেখা যায়নি। যে-বছরে জন ফেরিয়ার সবচেয়ে ধনী চাষি রূপে স্বীকৃতি পেল সারাতল্লাটে, সেই বছরেই অনন্যা আমেরিকান সুন্দরীরূপে নাম ছড়িয়ে পড়ল লুসি ফেরিয়ারেরও।

শিশু লুসির যুবতী হওয়ার ঘটনা শুধু যে পিতৃদেবের নজরেই পড়েছিল–তা নয়। এসব ক্ষেত্রে কদাচিৎ তা ঘটে। রহস্যজনক এই পরিবর্তন আসে মৃদুমন্দ সঞ্চরণে, পা টিপে

টিপে অতি সংগোপনে দিনকাল তারিখ সময় দিয়ে সে-হিসেব রাখা যায় না। লুসি নিজেও সচেতন ছিল না পরিবর্তনটা সম্পর্কে। খেয়াল হল যখন তার গলার স্বর নিজের কানেই একদিন অদ্ভুত শোনাল, বিশেষ একজনের হাতের ছোঁয়ায় বিচিত্র রোমাঞ্চ জাগ্রত হল বুকের মধ্যে। সভয়ে, সগর্বে সে জানল প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে, অনেক ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে তার তনুমনে। নতুন জীবনের এই উষাকাল যেদিন, যেভাবে দেখা দেয় কুমারী জীবনে কোনো মেয়েই তা ভোলে না। লুসি ফেরিয়ারের জীবনে এই মুহূর্ত এল বিষম গুরুত্ব নিয়ে। প্রভাব গিয়ে পড়ল তার ভবিষ্যৎ ভাগ্যচক্রে। সিরিয়াস ঘটনার রেশ প্রতিফলিত হল অন্যান্য অনেক ব্যাপারেও।

জুন মাসের প্রভাত। পথঘাটে মাঠে প্রান্তরে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো শ্রমব্যস্ত মানুষের চাঞ্চল্য ক্যালিফোর্নিয়ায় সোনা খোঁজার হিড়িক আরম্ভ হয়েছে। স্থলপথে রাস্তা গিয়েছে ইলেক্ট সিটির মধ্য দিয়ে। রাস্তায় তাই চলেছে সারি সারি ধূলিধূসরিত মালবোঝাই অশ্বতরঙ্গ। চলেছে অশ্ব আর অধিবাসীরা, পথশ্রমে ক্লান্ত, চলেছে দু-পাশের কর্ষিত ভূমির দিকে বলদ আর মেষ। পাঁচমিশেলি এই জনবাহনের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে চলেছে লুসি ফেরিয়ার। অভ্যস্ত দক্ষতায় চালনা করছে তেজি ঘোড়াকে, কখনো লাফিয়ে, কখনো দুলকি চালে চলেছে সে অপরূপ ভঙ্গিমায়। বাদাম রঙের সুদীর্ঘ চুল উড়ছে পেছনে, ব্যায়াম-উচ্ছ্বাস জনিত রক্তচাপে লাল হয়ে উঠেছে মুখশ্রী। শহর থেকে বেরিয়েছে সে বাবার একটা কাজ নিয়ে। আগেও এভাবে বেরোতে হয়েছে। ভয়ডর তাই একেবারেই নেই। যৌবনের যা ধর্ম। কাজটা শেষ করতে হবে, এ ছাড়া কোনো চিন্তাও নেই। পথক্লান্ত দুঃসাহসীরাও অবাক হয়ে দেখছে তার এই মূর্তি। এমনকী সুখে দুঃখে উদাসীন

রেড ইন্ডিয়ানরাও ঔদাসীন্য ত্যাগ করে ঘাড়ের বোঝা বিস্মৃত হয়ে সবিস্ময়ে দেখছে পাণ্ডুর মুখ এই অসামান্যা সুন্দরীর আশ্চর্য রূপ।

শহরের প্রান্তসীমায় পৌঁছে মুশকিলে পড়ল লুসি। রাস্তা জুড়ে আসছে গোরু মোষের বিরাট একটা দল। তৃণভূমি থেকে তাড়িয়ে আনছে জনা ছয়েক বুনো চেহারার পশুপালক। তর সইল না লুসির। রাস্তা বন্ধ দেখে অধীর হয়ে ছোটো একটা ফাঁকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল ঘোড়া। ঢুকতে ঢুকতেই চারদিক থেকে নিরেট ভাবে গোরু মোষ বলদ ঘিরে ফেলল ওকে। ভীষণ লম্বা শিং নেড়ে, বুক-কাঁপানো চোখে তাকিয়ে ধেয়ে চলল ওকে ঘিরে, কিন্তু তাতে ভয় নেই লুসির। গোরু মোষ বলদ সামলাতে হয় কী করে তা সে জানে! তাই অকুতোভয়ে ওই অবস্থাতেও, ঘোড়া নিয়ে সদ্ব্যবহার করে চলল ছোটোখাটো সুযোগের, দীর্ঘ মিছিল ঠেলে বেরিয়ে যাওয়ার আশায় ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে চলল অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। এই সময়ে ইচ্ছায় হোক কী অনিচ্ছায় হোক, একটা শিংয়ের প্রচণ্ড গুতো লাগল মাসট্যাঙের পাশে, তাতেই খেপে গেল ঘোড়া। চক্ষের নিমেষে দাঁড়িয়ে গেল শির পা হয়ে এবং ভীষণ উত্তেজিত হয়ে এমনভাবে দাপাদাপি শুরু করে দিলে যে বসে থাকাই মুশকিল হল লুসির পক্ষে। রেগে নাক দিয়ে নিশ্বাসের ঝড় বইয়ে, হ্রেষারব করে পেছনের দু-পায়ে ঘন ঘন দাঁড়িয়ে উঠে ফেলে দিতে চাইল আরোহিণীকে। পাকা ঘোড়সওয়ার বলেই বারংবার সে-চেষ্টা ব্যর্থ করল লুসি! কিন্তু ক্রমশ তীব্র হতে লাগল সংকট বেড়েই চলল বিপদ। খ্যাপা ঘোড়ার চাট খেয়ে খেপে গেল বলদ আর মোষেরাও। এক একটা লাথির জবাব দিতে লাগল উপর্যুপরি শিংয়ের গোঁতায়। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল মাসট্যাঙের উন্মত্ততা। অতিকষ্টে জিন আঁকড়ে ধরে ঘোড়ার পিঠে সেঁটে রইল লুসি—ঠিকরে পড়লেই দলিত পিষ্ট, ছিন্নভিন্ন হতে হবে ভয়ার্ত চক্ষু, ক্ষিপ্ত চতুষ্পদের

খুরের তলার–অতীব ভয়ানক সেই মৃত্যু বর্ণনারও অতীত। অতর্কিতে বিপদগ্রস্ত হলে কীভাবে সামলাতে হয় নিজেকে, এই অভিজ্ঞতা কিন্তু ছিল না লুসির। তাই মাথা ঘুরতে লাগল লম্ফঝম্ফ, হাঁকডাক, তাণ্ডব নৃত্যের মাঝে; শিথিল হয়ে এল মুষ্টি লাগামের ওপর। ধুলোর মেঘে দম আটকে আসছে, ক্ষিপ্ত চতুষ্পদের গায়ের ঘাম বাষ্পাকারে উঠে নাসারন্ধ্র যেন বুজিয়ে দিতে চাইছে; এ অবস্থায় ভাগ্যের হাতেই নিজেকে সঁপে দিতে লুসি হতাশ হয়ে ছেড়ে দিতে লাগাম কিন্তু তার আগেই দরদ-মাখা একটা কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল পাশে–বললে, ভয় নেই! লাগাম ধরে থাকুন–ছাড়বেন না! সঙ্গেসঙ্গে ধূলি মেঘের মধ্যে থেকে এগিয়ে এল দড়ির মতো পাকানো একটা বলিষ্ঠ বাদামি হাত শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ভয়ার্ত ঘোড়ার মুখের লাগাম এবং ওই দাপাদাপির মধ্যে দিয়ে টেনে বার করে আনল মিছিলের বাইরে।

ভদ্রভাবে বললে উদ্ধারকারী, মিস, লাগেনি তো?

রোদে-পোড়া কালচে ভীষণ মুখটার পানে চাইল লুসি। প্রগল্ভ হাসি হেসে বললে অকপটে, ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। এক পাল গোরুর মাঝে পড়ে এত ভয় পাব ভাবতে পারিনি।

ভাগ্যিস সিট ছাড়েননি–পিঠ থেকে পড়লে আর বাঁচতেন না। বক্তা বয়েসে তরুণ। দীর্ঘকায় বুনো চেহারা। ছাই রঙের লোমযুক্ত তামাটে বর্ণ বিশিষ্ট অত্যন্ত তেজিয়ান ঘোড়ায় বসে দৃপ্ত ভঙ্গিমায়। পরনে শিকারীর মোটা কর্কশ পোশাক। কাঁধে লম্বা রাইফেল। আপনি বোধ হয় জন ফেরিয়ারের মেয়ে। তার বাড়ি থেকেই ঘোড়া নিয়ে বেরোতে দেখলাম আপনাকে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করবেন সেন্ট লুইয়ের জেফারসন

হোপকে মনে পড়ে কিনা। উনি যদি সেই ফেরিয়ার হন, তাহলে জানবেন আমার বাবা ওঁর বন্ধু ছিলেন।

গম্ভীরভাবে লুসি বললে, তার চেয়ে আপনি নিজেই এসে একদিন জিজ্ঞেস করুন না?

প্রস্তাবে খুশি হয়েছে বলে মনে হল তরুণটি। আনন্দে চিকমিক করে উঠল কালো চোখ। বললে, আসব! মাস দুয়েক হল পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরছি। ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়ার মতো চেহারা নয়। নিশ্চয় কিছু মনে করবেন না?

বরং অনেক ধন্যবাদ জানাবেন। আমিও জানাব। আমি ওঁর চোখের মণি। গোরুর লাথিতে মারা গেলে সে-ধাক্কা বাবা কাটিয়ে উঠতে পারতেন না ইহজীবনে।

আমিও না।

আপনি! আরে আমি মরলে আপনার কী? আপনি তো আমাদের বন্ধুও নন।

মন্তব্য যেন শেল হয়ে বিধল শিকারির বুকে। মুখটা এমন শুকিয়ে গেল যে গলা ছেড়ে হেসে উঠল লুসি।

বললে, এই দেখুন! সত্যিই কি আমি তাই বলছি? ওটা কথার কথা। এখন তো আপনি আমার বন্ধুই। আসা চাই কিন্তু, ভুলবেন না। আর দাঁড়াতে পারছি না। দেরি হয়ে গেলে কাজ দিয়ে আর আমাকে বিশ্বাস করবেন না বাবা। গুড বাই।

গুড বাই! প্রশস্ত কিনারাযুক্ত সমব্রেরো টুপি তুলে অভিবাদন করে তরুণটি, ঈষৎ হেঁট হয়ে স্পর্শ করে লুসির সুচারু হাত। মাসট্যাঙের মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চাবুক হাঁকড়ায় লুসি, ধূলি-কুণ্ডলীর মধ্য দিয়ে উল্কার মতো ধেয়ে যায় চওড়া পথ বেয়ে।

বিষণ্ণ, মৌন মুখে সঙ্গীদের নিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে যায় তরুণ জেফারসন হোপ। নেভাদা মাউন্টেনে ওরা ঘুরছে রুপোর খোঁজে। সন্ধানও পেয়েছে। সল্টলেক সিটিতে এসেছিল মূলধনের খোঁজে–রুপো তোলবার জন্যে। কাজের সময়ে সে অনন্য-মন। কিন্তু আজকের ঘটনায় মন তার অস্থির কাজ ছেড়ে অন্য চিন্তায় ব্যাপৃত। সিয়েরা সমীরণের মতো সতেজ এত সুন্দরী অকপট মেয়েটি নাড়া দিয়ে গেছে তার আগুন পাহাড়ের মতো বন্য হৃদয়ের মূল পর্যন্ত। অপস্রিয়মাণ অশ্বারোহিণীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত অন্তর দিয়ে সে উপলব্ধি করেছে বড়ো কঠিন সংকট এসেছে তার জীবনে। রুপো অন্বেষণ বা তার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ নূতন একটি বিষয় ছেয়ে ফেলেছে তার মনের দিগদিগন্ত। এ-ভালোবাসা অস্থিরমতি বালকের চঞ্চল প্রেমে নয়, দৃঢ়চেতা পুরুষের কঠিন সংকলন! প্রভুত্ব যার মেজাজে স্ফুলিঙ্গের মতোই বিচ্ছুরিত–দাবানলের মতোই প্রেমের আগুন আচমকা জ্বলছে সেই চিত্তে। দুর্দান্ত, বন্য আবেগে মথিত তার হৃদয়। জীবনে যা সে চেয়েছে, তাই পেয়েছে। কোনো প্রয়াসই তার ব্যর্থ হয়নি। এখনও হবে না। মনে মনে শপথ নিল জেফারসন হোপ, এই ইচ্ছা, এই

কামনা, এই যাজ্ঞা, যদি মানুষের সাধ্যাতীত না হয় তবে তা সার্থক হয়ে উঠবেই তার জীবনে।

সেই রাতেই জন কেরিয়ারের বাড়ি এল সে, এল তারপরেও অনেকদিন, মুখচেনা হয়ে গেল খামারবাড়ির প্রত্যেকের সাথে। খেতখামার নিয়ে তন্ময় থাকায় এই বারো বছর বহির্জগতের কোনো খবর পায়নি জন। সে-খবর পাওয়া গেল জেফারসনের মুখে। কথা বলার ভঙ্গিমাটি তার বড়ো সুন্দর। শুধু বাপের নয়, মেয়েরও ভালো লাগত শুনতে। ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যাডভেঞ্চার অভিযানের পথিকৃৎ সে। সরস বর্ণনা শুনিয়েছে সেইসব দুরন্ত দিনগুলোর–সুখ আর শান্তিতে ভরা মধুময় অ্যাডভেঞ্চার কাহিনি শুনতে শুনতে বিচিত্র রোমাঞ্চ অনুভব করেছে। পিতাপুত্রী দু-জনেই। আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে কুবের সম্পদ পেয়েও হারিয়ে ফেলার রুদ্ধশ্বাসী বর্ণনায়। জেফারসন হোপ একাধারে সন্ধানী স্কাউট, ফাঁদে ফেলে পশুশিকারী, রুপো অন্বেষক এবং র্যাঞ্চম্যান অর্থাৎ গোরুমোষের পরিচালক। যেখানে বুক-কাঁপানো অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাওয়া গিয়েছে, জেফারসন হোপ ছুটে গিয়েছে সেইখানে।

এইভাবেই দু-দিনেই বৃদ্ধ কৃষক জন কেরিয়ারের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল জেফারসন। শতমুখে জন প্রশংসা করত জেফারসনের গুণের নাকি তার শেষ নেই। সত্যিই হিরের টুকরো ছেলে। নীরবে শুনত লুসি। তবে আরক্ত মুখ আর সুখ চকচকে উজ্জ্বল চক্ষু দেখে বোঝা যেত মন তার চুরি গিয়েছে। লক্ষণগুলো পিতৃদেবের নজরে না-এলেও যার জন্যে সে পাগলিনী, তার নজর এড়ায়নি।

গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায় সড়ক বেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে এল তার ঘোড়া–দাঁড়াল ফটকের সামনে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ছিল লুসি। ওকে দেখেই এগিয়ে এল কাছে। বেড়ার ওপর লাগাম নিক্ষেপ করে বাগানের পথ বেছে মুখোমুখি দাঁড়াল জেফারসন।

লুসির দু-হাত তুলে নিয়ে নিবিড় চোখে মুখপানে তাকিয়ে বললে প্রেমস্নিগ্ধ কণ্ঠে, লুসি, আমি চললাম। এখন তোমায় নিচ্ছি না সঙ্গে, কিন্তু পরের বার আসবে তো?

কবে আসবে? রক্তিম মুখে হেসে বলে লুসি। মাস দুই পর। এসেই তোমার পাণি প্রার্থনা করব। পৃথিবীতে কেউ নেই আমাকে রোখে। বাবা?

রাজি হয়েছেন। শুধু একটা শর্ত–রুপপার খনিতে কাজ দেখাতে হবে। সে-ব্যবস্থা হয়ে এসেছে।

জেফারসনের কপাটের মতো বিশাল বুকে লজ্জারুণ মুখ লুকিয়ে লুসি বললে, বাবা আর তুমি দু-জনেই যখন ব্যবস্থা করে ফেলেছ, আমি আর কথা বলব না।

আঃ বাঁচালে! আবেগে গলা ভেঙে যায় জেফারসনের। আনত মুখে মুখ চুম্বন করে লুসির। তাহলে ওই কথাই রইল। আর দেরি করব না। যতই থাকি না কেন, যেতে আর ইচ্ছে যায় না। ওরা যে গিরিখাদে পথ চেয়ে আছে আমার। গুড বাই, ডার্লিং, গুড বাই। ফের দেখা হবে দু-মাস পরে।

জোর করে লুসির বাহুপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে পড়লে জেফারসন। টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে উধাও হল দূর হতে দূরে–ক্ষণেকের জন্যেও পেছনে তাকাল না–পাছে মন দুর্বল হয়ে যায়, যেতে ইচ্ছে না হয়। ফটকে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে রইল লুসি! ধাবমান ঘোড়সওয়ার বিন্দুর মন ছোট্ট হয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর বুকজোড়া সুখ নিয়ে ফিরে এল বাড়িতে এত সুখ সেই মুহূর্তে বোধ হয় আর কোনো মেয়ের বুকে ছিল না।

অবতারের সঙ্গে কথা বলল জন ফেরিয়ার

সল্টলেক সিটি ছেড়ে জেফারসন হোপ রওনা হওয়ার তিন সপ্তাহ পরের ঘটনা জেফারসন ফিরে আসার পর কী ঘটবে ভাবতেই মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে জনের। প্রাণাধিকা পালিতা কন্যা জন্মের মতো পর হয়ে যাবে সেদিন থেকে। কিন্তু মুখে হাসি এনে ব্যস্ত রেখেছে নিজেকে উদ্যোগ পর্বে। মেয়েকে মর্মোনের সঙ্গে বিয়ে দেবে না, গোড়া থেকেই এই ছিল ওর গোপন সংকল্প। ওটা আবার একটা বিয়ে নাকি। মাথা কাটা যায়। মানসম্মান খোয়াতে হয়। মর্মোন মতবাদ সম্বন্ধে জন ফেরিয়ারের ধারণা যাই থাকুক না কেন, এই একটি ব্যাপারে সে অনমনীয়। অথচ মনের কথা মনেই রাখতে হয়েছে। সাধুদের এই দেশে গোঁড়ামির বিরুদ্ধে কথা বলাটা বিপজ্জনক।

সত্যিই বিপজ্জনক। এতই বিপজ্জনক যে অত্যন্ত সাধু প্রকৃতির ব্যক্তিও ধর্ম নিয়ে নিজস্ব মতবাদ প্রকাশ্যে জাহির করতে ভয় পায়। ফিসফিস করে বলে একান্তে—পাছে কারো কানে যায়। কেননা, তৎক্ষণাৎ সোজা কথার বাঁকা মানে দাঁড় করানো হবে এবং ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। একদা যারা নিগৃহীত হয়েছে, এখন তারা নিজেরাই নিগ্রহ সৃষ্টি করে চলেছে নিজেদের মধ্যেই এবং সে-নিগ্রহ এত ভয়াবহ যে বর্ণনা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। উটায় যে নিগ্রহ-যন্ত্র সেই মুহূর্তে সক্রিয় তার সমকক্ষ ব্যবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না ইটালির গুপ্ত সমিতি, জার্মানদের vehmgericht অথবা, সেভিলের ইনকুইজিশন নামক ধর্মীয় তদন্ত সংস্থা।

এরা অজেয়, এরা রহস্যাবৃত–তাই এদের নিগ্রহ ব্যবস্থাও দ্বিগুণ ভয়াবহ। এদের সংগঠন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ—অথচ সে-সংগঠনকে কেউ দেখেনি, নাম শোনেনি। গির্জের বিরুদ্ধে যে রুখে দাঁড়িয়েছে, সে চিরতরে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। কোথায় গিয়েছে বা কী অবস্থায় আছে, কেউ জানতেও পারেনি! বউ ছেলে-মেয়েরা পথ চেয়ে বসে থেকেছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস–কিন্তু গুপ্ত বিচারপতিদের বিচারে তার কী হাল হয়েছে–কেউ এসে সে-খবর শুনিয়ে যায়নি। রাগের মাথায় একটা কথাও যদি কেউ বলে ফ্যালে, বা কিছু করে ফ্যালে তাহলে তাকে ধরাধাম ত্যাগ করতে হয়েছে তৎক্ষণাৎ অথচ কাকপক্ষীও জানতে পারেনি মাথার ওপর ঝোলানো এই অদৃশ্য খঙ্গটির স্বরূপ কী, ভয়াবহ এই শক্তির চেহারা চরিত্র কী। লোকে ভয়ে কাঁপত এই কারণেই। বিজন মরুর বুকে বসেও অত্যাচারী এই শক্তির বিরুদ্ধে মনের কথা কানাকানি করতেও সাহস পেত না।

অস্পষ্ট অথচ ভয়ংকর এই শক্তির প্রথম প্রয়োগ ঘটেছিল কেবল যারা অবাধ্য তাদের ওপরেই; মর্মোন ধর্মমত গ্রহণ করেও যারা পরে তা বর্জন করতে চেয়েছে অথবা কলঙ্কিত করতে চেয়েছে। অচিরেই আরও ব্যাপকভাবে সক্রিয় হল কুটিল, করাল এই শক্তি। স্ত্রীলোকের জোগান কমে আসছিল মর্মোনদের মধ্যে পুরুষ বেশি, মেয়ে কম। অথচ বহুবিবাহ প্রথাও প্রচলিত রয়েছে। নারীর সংখ্যা কমে এলে এ-মতবাদও ধোপে টিকবে না। অদ্ভুত গুজব শোনা যেতে লাগল তখন থেকেই। অনেকরকম বিচিত্র কাহিনি মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল মর্মোনদের মধ্যে। যেসব জঙ্গলে রেড ইন্ডিয়ানদের মতো লুঠেরা নরহত্যাকারীদের কখনো দেখা যায়নি, সেসব জায়গাতেও নাকি আজকাল দেশত্যাগী অধিবাসী খুন হচ্ছে, তাদের শিবির লুঠ হয়ে যাচ্ছে। বয়স্কদের হারেমে নতুন নতুন স্ত্রীলোকের আমদানি ঘটছে। চোখে তাদের অশ্রু, কণ্ঠে শোকের হাহাকার, সর্ব অবয়বে

ভয়াবহ অভিজ্ঞতার অবর্ণনীয় ছাপ। সেই শোক, সেই অশ্রু, সেই অভিজ্ঞতা ম্লান হবার নয়। কিছু কিছু দুঃসাহসী ভ্রাম্যমাণ বললে, রাতের অন্ধকারে মুখোশধারী সশস্ত্র আততায়ীরা নাকি দল বেঁধে আসে বাঘের মতো নিঃশব্দ সঞ্চরণে–অসহায় পথচারীর সর্বনাশ করে অদৃশ্য হয়ে যায় দিগন্তে। এই গল্প, এই কাহিনি লোকের মুখে মুখে বার বার শোনা গিয়েছে, মিথ্যে যে নয় সে-প্রমাণও মিলেছে, আস্তে আস্তে তা একটা বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে, একটা নির্দিষ্ট নামে পর্যবসিত হয়েছে। আজও পশ্চিমের র‍্যাঞ্চ মালিকের কাছে ড্যানাইট ব্যান্ড বা অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলস একটা হৃৎকম্পনকারী পৈশাচিক নাম–এ-নাম শুনলেই অনেক পাপাচার, অনেক দানবিক ঘটনার কাহিনি জাগ্রত হয় স্মৃতিতে।

রহস্যময় এই সংগঠন সম্বন্ধে বিশদ খবর জানা যাওয়ার পর লোকের আতঙ্ক হ্রাস পাওয়ার বদলে আরও বৃদ্ধি পেল। নির্মম এই সমিতির সদস্য কে বা কারা, কেউ তা জানত না। ধর্মের নামে এই খুন জখম রাহাজানি নারকীয় কাণ্ড যারা চালিয়ে যাচ্ছে গুপ্তই রয়ে গিয়েছে তাদের নাম। অবতারদের অধর্ম, কুকীর্তি বা তার ক্রুর অভীপ্সার কথা যাকেই বলা যাবে, দেখা যাবে হয়তো সে-ই এই নারকীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম নায়ক। রাতের অন্ধকারে সে তখন আসবে, আগুন আর তরবারি প্রয়োগে কল্পনাতীত ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিয়ে যাবে। নিকটতম প্রতিবেশীকেও কেউ তাই বিশ্বাস করত না। মনের কথা মনেই চেপে রাখত।

একদিন বেশ ফুরফুর ভোরে গমখেত অভিমুখে রওনা হতে যাচ্ছে জন ফেরিয়ার, এমন সময় খট করে হুড়কো খোলার আওয়াজ শুনল বাগানের ফটকে। জানলা দিয়ে দেখল

বলিষ্ঠ-আকৃতি, মধ্যবয়স্ক এক পুরুষ হন হন করে আসছে বাড়ির দিকে চুল তার হলদেটে লাল। দেখেই হৃৎপিণ্ডটা ডিগবাজি খেয়ে এসে ঠেকল গলার কাছে কেননা ব্রিগহ্যাম ইয়ং নিজেই যে বাড়ি বয়ে আসবে এ-যে ভাবাও যায় না। সন্ত্রাস আর কাঁপুনি যেন ফেটে পড়ল প্রতিটি লোমকূপের মধ্যে। সে যে জানে এর পরিণাম শুভ হতে পারে না কিছুতেই। শিউরে শিউরে উঠে জন দৌড়ে গেল মর্মোন প্রধানকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে। নিরুত্তাপ, গম্ভীর মুখে অভিবাদন গ্রহণ করল ব্রিগহাম ইয়ং! কঠিন মুখে জন কেরিয়ারের পেছন পেছন এসে বসল বসবার ঘরে।

হালকা রঙের চক্ষুপল্লবের তলা দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে জনকে নিরীক্ষণ করতে করতে বলল মর্মোন-গুরু–ব্রাদার ফেরিয়ার, তুমি যাদের বন্ধু পেয়েছ, তারা প্রত্যেকেই এ-ধর্মে প্রকৃত বিশ্বাসী। তুমি না-খেয়ে মরতে চলেছিলে মরুভূমির মাঝে। আমরা তোমাকে উদ্ধার করেছি, আহার্য দিয়েছি, নির্বিঘ্নে এই দৈবাদেশের রাজ্যে নিয়ে এসেছি, জমিজায়গার বেশ খানিকটা অংশ দিয়েছি, আমাদের ছত্রছায়ায় বড়োলোক হওয়ার সুযোগ দিয়েছি, ঠিক কিনা?

ঠিক, জবাব দিল জন ফেরিয়ার।

বদলে একটা শর্তই মেনে চলার কথা ছিল তোমার এই ধর্মমতকে তুমি মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে, সর্ব বিষয়ে নিষ্ঠা দেখাবে। কথা দিয়েছিলে অন্যথা হবে না। কিন্তু খবর আসছে, তুমি পায়ে ঠেলছ আমাদের ধর্মকে।

কীভাবে জানান? দু-হাত ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানায় জন ফেরিয়ার। সাধারণ তহবিলে আমি কি চাঁদা দিইনি? মন্দিরে যাইনি? আমি কি...

স্ত্রীরা কোথায় তোমার? ডাকো তাদের, কথা বলে যাই। আশপাশ তাকিয়ে বললে ইয়ং। বিয়ে আমি করিনি প্রয়োজন নেই বলে। আমি তো একা নয়–মেয়ে রয়েছে। তাকে দেখাশুনা করতে হয়। তা ছাড়া দেশের মেয়ের সংখ্যা কম বিয়ের প্রয়োজন আমার চাইতে যাদের বেশি, তাদের প্রয়োজন তো মিটছে।

তোমার এই মেয়ের ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি। মেয়েটি বড়ো হয়েছে–উটার ফুল বললে যা বোঝায়, সে তাই। গণ্যমান্য অনেকের চোখে পড়েছে, পছন্দও হয়েছে।

জন ফেরিয়ারের অন্তরাত্মা শিউরে উঠল এই কথায়।

অনেকরকম কথা কানে আসছে তোমার মেয়ে সম্পর্কে। সে নাকি একজন বিধর্মীর বাগদত্তা। এসব কথা নিছক গুজব বলেই ধরে নিচ্ছি। সবই গল্প বিশ্বাস করতে চাই না।

সেন্ট জোসেফ স্মিথের ত্রয়োদশ উক্তি মনে আছে? প্রত্যেক মেয়ের বিয়ে হোক সমধর্মাবলম্বী পুরুষের সঙ্গে। বিধর্মীকে যে পতিত্বে বরণ করবে, সে মহাপাপে নিমজ্জিত হবে। ধর্মসূত্র তুমি অক্ষরে অক্ষরে মনে চল বলেই বলেছি, মেয়েকে নরকে ঠেলে দিয়ো না—এই পবিত্র উক্তির অন্যথা হতে দিয়ো না।

জবাব দিল না জন ফেরিয়ার। নার্ভাসভাবে নাড়াচাড়া করতে থাকে ঘোড়ার চাবুক।

এই একটি ব্যাপারে তোমার ধর্মবিশ্বাস আমরা যাচাই করব ঠিক করেছি–চার বয়স্কর অধিবেশনে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে। তোমার মেয়ের বয়স কম, কাজেই বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হোক চাই না। তা ছাড়া, ওই ব্যাপারে তার নিজের মতের দামও দেওয়া হবে। আমাদের হারেমে পত্নী সংখ্যা অনেক। কিন্তু আমাদের ছেলেদেরও বউ থাকুক, এই আমরা চাই। স্ট্যানজারসনের এক ছেলে, ড্রেবারের দুই ছেলে। এরা খুশি হবে তোমার মেয়েকে পুত্রবধূ রূপে পেলে। এদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিক তোমার মেয়ে। ওরা বড়োলোক, বয়সও কম, ধর্মে প্রকৃত মতি আছে। বলো কী বলবে?

গ্রন্থিল ললাটে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল ফেরিয়ার।

তারপর বললে, ভাববার সময় দিন। মেয়ের আমার বয়স খুবই কম–বিয়ের বয়সই হয়নি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ইয়ং বললে, একমাস সময় দিলাম ভাববার। একমাস পরে ওকে জবাব দিতে হবে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল ইয়ং। আরক্ত মুখে জ্বলন্ত চোখে বললে বজ্রকণ্ঠে, জন ফেরিয়ার চার বয়স্কর আদেশ অমান্য করার চাইতে বরং তোমাদের দু-জনেরই হাড় সিয়েরা ব্লাঙ্কোর মরুভূমিতে পড়ে থাকাই ভালো।

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইয়ং। যাওয়ার সময় এমন একটা ইঙ্গিত করে গেল হাত আর মুখের ভঙ্গিমায় যা রক্ত জল করার পক্ষে যথেষ্ট। শিহরিত অন্তরে জন ফেরিয়ার শুনল বারান্দায় নুড়ি মাড়িয়ে বেগে অন্তর্হিত হচ্ছে মর্মোন প্রধান।

বসবার ঘরেই হাঁটুতে কনুই আর গালে হাত রেখে তখনও বসে জন ফেরিয়ার ভাবছে কীভাবে কথাটা পাড়বে মেয়ের কাছে, এমন সময় নরম হাতের ছোঁয়া লাগল কাঁধে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাশে। ফ্যাকাশে, ভয়ার্ত মুখ দেখেই বুঝল সে সব শুনেছে।

জন ফেরিয়ারের জিজ্ঞাসু চাহনির জবাবেই বললে লুসি, কী করব বল। গলা কী! সারা বাড়ি গম গম করছিল চেঁচানিতে। বাবাগো, কী করি বলো তো এখন?

মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে হলদেটে লাল চুলে সস্নেহে কর্কশ হাত বুলোত বুলাতে জন বললে, ঘাবড়াসনি! ব্যবস্থা একটা করবই। ওই ছোকরা সম্বন্ধে তোর মন ঠিক আছে তো?

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল লুসি। জোরে চেপে ধরল বাবার হাত। ওই তার জবাব। মুখে বলার দরকার হল না।

জন বললে, জানি তোর মন কোথায়। ছেলেটাও ভালো। হিরের টুকরো। সবচেয়ে বড় কথা, সে খ্রিস্টান। এরা মুখে যতই ধর্মের কথা কপচাক না কেন, এদের চেয়ে শতগুণে ভালো। কাল নেভাদায় একটা দল যাচ্ছে। ওদের হাতেই খবর পাঠাব ছোঁড়াকে। জানি তো ঝাটে পড়েছি শুনলেই দৌড়ে আসবে পাঁই পাঁই করে হারিয়ে দেবে ইলেকট্রো টেলিগ্রাফকেও।

প্রিয়বরের এহেন বর্ণনা বাবার মুখে শুনে সজল চোখে ফিক করে হেসে লুসি বলে, ও এলেই একটা ব্যবস্থা হবে। ওর মুখেই শোনা যাবে কী করা উচিত। তবে কী জান, যত ভয় তোমাকে। অবতারের বিরুদ্ধাচরণ করার শাস্তি নাকি ভয়ংকর কত গল্প না কানে আসে। রেহাই কেউ পায় না—কী যে হয় তাদের কেউ জানতেও পারে না।

বাবা বললে, কিন্তু বিরুদ্ধাচরণ তো এখনও করিনি। যখন করব তখন দেখা যাবে। একমাস তো হাতে আছে! মাস ফুরানোর আগেই উটা ছেড়ে চম্পট দেব।

উটা ছেড়ে চলে যাবে!

তা ছাড়া আর পথ নেই।

তোমার চাষবাস?

নগদ টাকা বার করে নেব যতটা পারি। বাকিটা থাকবে পড়ে। সত্যি কথা বলতে কী, অনেকদিন ধরেই এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ভাবছি। এদের মতে একজনের হুকুমে ওঠবোস করা আমার ধাতে নেই। আমি আমেরিকায় জন্মেছি, স্বাধীনতা আমার রক্তে। এদের গোলামি আমার সহ্য হচ্ছে না। এদের রীতিনীতিও আমার কাছে আজও অদ্ভুত। বয়স হয়েছে বলে ভাবিসনি যেন নতুন কিছু শেখবার ইচ্ছে আর নেই। তবে ফের যদি ও আসে এখানে গলাবাজি করতে, হয়তো গুলি খেয়ে মরতে হবে আমার হাতে।

কিন্তু আমাদের বেরোতে দেবে না তো, বললে লুসি।

জেফারসন এলেই একটা হিল্লে হয়ে যাবে। নে, চোখ মোেছ। কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে রাখিসনি। ছোঁড়া এসে ওই চোখে দেখলে আমাকেই একহাত নেবে। ভয়ের কিছু নেই! বিপদ একদম নেই।

কথাগুলো জন ফেরিয়ার খুব প্রত্যয় নিয়ে বললেও সেই রাতে লুসি কিন্তু দেখল দরজা জানালা বেশ করে ভেতর থেকে বন্ধ করছে পিতৃদেব এবং শোবার ঘরে ঝোলানো মরচেপড়া পুরোনো শটগান নামিয়ে গুলি ভরছে!

মর্মোন অবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরের দিন সকালে সল্টলেক সিটিতে গিয়ে পরিচিত সেই ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করল জন ফেরিয়ার। নেভাদা মাউন্টেন্স রওনা হচ্ছিল সে। তার মুখে খবর পাঠাল জেফারসন হোপের কাছে। সমূহ বিপদ। এখুনি যেন ফিরে আসে। খবর পাঠিয়ে হালকা মনে বাড়ি ফিরল জন।

খামারবাড়ির কাছাকাছি এসে অবাক হল ফটকের দু-পাশের পোস্টে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে দেখে। আরও অবাক হল বসবার ঘরটা দু-জন যুবা পুরুষের দখলে গিয়েছে দেখে। একজনের মুখ লম্বাটে ধাঁচের, ফ্যাকাশে। দোলানো চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বসে দু-পা তুলে দিয়েছে স্টোভের ওপর, আর একজনের ঘাড়টা ষাঁড়ের ঘাড়ের মতো মোটা, মুখ চোখ ফুলোফুলো কর্কশ। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে দু-হাত গুঁজে একটা চলতি গানের সুর শিস দিয়ে গাইছে। ফেরিয়ার ঘরে ঢুকতে দু-জনেই মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাল। তারপর কথা শুরু করলে চেয়ারে আসীন ছোকরা।

বললে, চিনতে পারছেন না নিশ্চয়। এ হল বয়স্ক ড্রেবারের ছেলে। আর আমি জোসেফ স্ট্যানজারসন। মনে পড়ছে? মরুভূমির মাঝে দয়ালু ঈশ্বর যখন দু-হাত বাড়িয়ে আপনাদের কোলে টেনে নিয়েছিলেন, তখন আপনাদের সঙ্গে যে ছিল সেই আমি।

সঙ্গী ছোকরা নাকিসুরে বললে, সবাইকে এইভাবেই কোলে টেনে নেবেন তিনি সব জাতের মানুষকে। ওঁর কাজ আস্তে হলে কী হবে–পাকা ব্যাপার।

জন ফেরিয়ারের চোখ-মুখ তখন শীতল বরফের মতোই কঠিন। কঠিন মুখে কেবল ঘাড় হেলিয়ে সায় দিলে। মক্কেল দু-জনের উদ্দেশ্য সে আঁচ করেছে।

স্ট্যানজারসন বললে, বাবাদের কথায় আমরা এসেছি আপনার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে। দু-জনের মধ্যে যাকে হয় বেছে নিতে পারেন। ব্রাদার ড্রেবারের সাতজন স্ত্রী, আমার মোটে চারজন। কাজেই আমার দাবিই বেশি।

আরে না, না, ব্রাদার স্ট্যানজারসন, চিলের মতো চেঁচিয়ে উঠল ড্রেবার! কার ক-জন বউ আছে, সেটা তো সমস্যা নয়–সমস্যা হল কে ক-জন বউকে পুষতে পারে। কারখানাটা আমাকে দিয়ে দিয়েছে বাবা। তার মানে তোমার চাইতে আমার রেস্ত এখন বেশি।

তেতে উঠে বললে অপরজন, কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ তোমার চেয়ে ভালো। ভগবান আমার বাবাকে কাছে টেনে নিলেই আমি যে শুধু চামড়া ট্যান করার আর চামড়ার কারখানাই পাব তা নয়–তোমার বয়স্কও হব গির্জেতে অনেক উঁচু পদও পাব।

আয়নার নিজের চেহারাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে সপ্রতিভ কণ্ঠে বললে ড্রেবার তনয়, তাহলে কনেই বেছে নিক কাকে পছন্দ। সে যা বলবে তাই হবে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ফুসছিল জন ফেরিয়ার। হাত নিশপিশ করছিল ঘোড়ার চাবুক দিয়ে দুই রাসকেলের পিঠ রক্তাক্ত করার জন্যে। অতিকষ্টে সামলে রেখেছিল নিজেকে।

এখন এগিয়ে এল দু-জনের সামনে। বললে কড়া গলায়, দ্যাখো ছোকরা আমার মেয়ে যদি ডাকে, তবে এস। তার আগে যেন এ-বাড়িতে আর কারো মুখ না-দেখি।

দুই তরুণ মর্মোন হাঁ করে চেয়ে রইল ফেরিয়ারের মুখের দিকে। জীবনে এত অবাক তারা কখনো হয়নি। বলে কী লোকটা! ওরা যে-মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তার তত বর্তে যাওয়া উচিত? এর চাইতে বড়ো সম্মান এদেশে আর আছে নাকি?

এবার ফেটে পড়ল ফেরিয়ার, এ-ঘর থেকে বেরোনোর পথ দুটো—দরজা–আর জানালা। পছন্দ কোনটা?

দুই মূর্তিমান দেখলে গতিক সুবিধের নয়। জন ফেরিয়ারের বাদামি মুখে বন্য বর্বরতা ফুটে উঠেছে। দীর্ঘ শীর্ণ হাত দুটো নিশপিশ করছে। আর এক মুহূর্ত দেরি করা সমীচীন নয়। ছিটকে বেরিয়ে গেল দু-জনেই। পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত গেল জন ফেরিয়ার।

বললে শ্লেষতীক্ষ্ণ গলায়, কোনটা পছন্দ নিজেদের মধ্যে ঠিক করে নিয়ে জানিয়ে আমাকে, কেমন?

এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে! রাগে সাদা হয়ে বিকট চেঁচিয়ে বললে স্ট্যানজারসন, অবতারের কথা আর চার বয়স্কর নির্দেশ পায়ে ঠেলার ফল হাতেনাতে পাবেন। মরণকালেও ঠেলাটা টের পাবেন।

তাহলে আয় তোদের ঠেলাটা টের পাইয়ে দিই, দারুণ চেঁচিয়ে পেছন ফিরেই বন্দুক আনতে দৌড়াল ফেরিয়ার বাধা দিলে লুসি। জাপটে ধরে রইল বাবাকে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল দূরে। নাগালের বাইরে পালিয়েছে দুই মস্তান।

রাগে টগবগ করে ফুটতে ফুটতে গরজে উঠল ফেরিয়ার, শয়তান রাসকেল কোথাকার। ওদের হাতে তোকে দেওয়ার চাইতে কফিনে শুইয়ে দেওয়াও ভালো।

যা বলেছ। গলায় দড়ি দেব ওদের ঘরে যাওয়ার আগে, সমান তেজে বললে লুসি! কিন্তু মাথাটা ঠান্ডা করো তুমি। জেফারসন এসে গেল বলে।

যত তাড়াতাড়ি আসে ততই মঙ্গল। কবে যে কী ঘটবে বুঝতে পারছি না।

সত্যিই ওদের এখন পরামর্শ দরকার, সাহায্য দরকার। এ দুটি দিতে যে পারে এমন কেউ এখুনি যেন এসে দাঁড়ায় কাঠগোঁয়ার অথচ কষ্টসহিষ্ণু জন ফেরিয়ার আর তার পালিতা মেয়ের পাশে। উটার উপনিবেশের পত্তন হওয়ার পর থেকে এ-জাতীয় অবাধ্যতা কখনো ঘটেনি। বয়স্কদের আদেশ পায়ে মাড়িয়ে যাওয়ার এহেন সাংঘাতিক নজির

কখনো দেখা যায়নি। লঘু পাপে যদি গুরু দণ্ড হয়ে থাকে, তাহলে এই অপরাধের শাস্তির নমুনাটা যে কী ধরনের হবে তা ভাবাও যায় না। অনেক নিগ্রহ লেখা আছে ডাকসাইটে এই বিদ্রোহীদের কপালে। টাকা দিয়ে এ-নিগ্রহ আটকানো যায় না। এর আগেও দেখা গেছে অনেক ধনবানদের কপাল পুড়েছে, রহস্যজনকভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, ধনসম্পত্তি গির্জের খপ্পরে গিয়েছে। জন ফেরিয়ারও রেহাই পাবে না যত বোলোকই সে হোক না কেন সমাজে সে যত মান্যগণ্যই হোক না কেন–কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। ভীতু সে নয়, দুর্দান্ত সাহস তার অণু-পরমাণুতে–তা সত্ত্বেও একটা চাপা, অস্পষ্ট, ছায়া কালো করাল আতঙ্ক কুরে কুরে খাচ্ছে হৃদয়ের অন্তস্থল, শিহরন জাগছে প্রতিটি লোমকূপে। যে-বিপদ জানা আছে, সে-বিপদের সামনে দাঁড়াতে ভয় পায় না জন কেরিয়ার। কিন্তু এই উৎকণ্ঠা অসহ্য। স্নায়ু কাপছে সেই কারণেই। মেয়ের কাছে অবশ্য মনের ভয় লুকিয়ে গেল জন। যেন কিছুই ঘটেনি, মুখে এমনি একটা হালকাভাব দেখালেও মেয়ের তীক্ষ্ণ নজরে এড়াল না কিছুই। স্পষ্ট দেখল, অস্বস্তি প্রকট হয়েছে ডাকাবুকো বাবার মুখেও।

জন আশা করেছিল তার এই আচরণের জবাব দেবে ইয়ং! হয় হুমকি, নয় ভৎর্সনা আসবে পত্রবাহক মারফত। সত্যিই তা এল এবং অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল বুকের ওপর গায়ের চাপায় একটা চৌকো কাগজ পিন দিয়ে আটকানো। তাতে আঁকাবাঁকা বড়ো বড়ো হরফে লেখা :

উনত্রিশ দিন দেওয়া হল প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তারপর—

শেষের ওই ড্যাশটাই সবচেয়ে আতঙ্ক-উদ্রেককারী, বিশ্বের করালতম বিভীষিকাও বুঝি তুচ্ছ সামান্য ওই ড্যাশটুকুর তুলনায়। হুমকিটা ঘরের মধ্যে এল কী করে কিছুতেই বুঝে উঠল

জন ফেরিয়ার। চাকরবাকর তো সব ঘুমোয় আউট হাউসে দরজা জানালা ভেতর থেকে বন্ধ। কাগজটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিল জন–বেমালুম চেপে গেল মেয়ের কাছে। কিন্তু কলজে পর্যন্ত হিম হয়ে গেল এই ঘটনায়। তিরিশ দিন সময়ের বাকি রইল মাত্র উনত্রিশটি দিন। ইয়ংয়ের দেওয়া সময়সীমা থেকে বাদ গেল একটি দিন। যে-শত্রু এহেন রহস্যময় শক্তির অধিকারী, তার সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো সরঞ্জাম বা সাহস তো জন ফেরিয়ারের নেই। যে-হাত রাত্রিনিশীথে ওই কাগজ পিন আটকে গেঁথে দিয়ে গেছে বুকের ওপর অনায়াসে সেই হাত একটা ছোরাও গেঁথে দিয়ে যেতে পারত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। জন ফেরিয়ার জানতেও পারত না মৃত্যু হল কার হাতে।

পরের দিন সকালে বুক ছাঁৎ করে উঠল আবার একটা ঘটনায়। এবার বুক কাঁপল আরও বেশি। প্রাতরাশ খেতে বসেছিল বাপ বেটিতে। ওপরে তাকিয়ে আচমকা সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। চোখ তুলল জন ফেরিয়ার। দেখল ঘরের কড়িকাঠে সম্ভবত পোড়া কাঠ দিয়ে লেখা শুধু একটি সংখ্যা–২৮। মেয়ে অবশ্য মানেটা বুঝল না, বাবাও ব্যাপার ভাঙল না। সেই রাতেই বন্দুক নিয়ে বসে রইল পাহারায়। চোখে কিছু পড়ল না, কানেও কিছু ভেসে এল না । অথচ ভোরবেলা দরজা খোলার পর দেখলে পাল্লায় বড়ো বড়ো আকারে রং দিয়ে লেখা–২৭।

এইভাবে গড়িয়ে চলল একটার পর একটা দিন! এক-একটা রাত ভোর হয়েছে, চোখ রগড়ে জন ফেরিয়ার আবিষ্কার করেছে অদৃশ্য শত্রু বাড়ির কোথাও-না-কোথাও বেশ দৃষ্টিগোচর স্থানে লিখে রেখেছে বাকি দিনের বিজ্ঞপ্তি, মাস ফুরোতে আর কটা দিন বাকি তার হিসেব। মৃত্যু সংখ্যা কখনো আবির্ভূত হয়েছে মেঝেতে, কখনো দেওয়ালে, কখনো বাগানের ফটকে সাঁটা পোস্টারে। চৌপর দিন রাত হুঁশিয়ার থেকেও কিছুতেই জন ফেরিয়ার দেখতে পেল না বিজ্ঞপ্তিগুলো লটকে যাচ্ছে কে, কখন, কীভাবে। নিঃসীম আতঙ্ক ধীরে ধীরে গ্রাস করতে লাগল বেচারিকে। একটা অবোধ্য কুসংস্কারের মতোই বিকট ভয় পেঁচিয়ে ধরতে লাগল মনটাকে প্রতিদিন সংখ্যাগুলো দেখবার পরেই। কিন্তু আর কিছুই করার নেই। অসহায় শিকারকে শিকারি যখন তাড়া করে, তখন তার যে অবস্থা হয়–জন ফেরিয়ারের অবস্থা এখন তাই। উদ্ভ্রান্ত, অস্থির, ভয়ার্ত। জীবনে তার বাঁচবার আশা, এখন একটাই—নেভাদা থেকে তরুণ শিকারীর প্রত্যাবর্তন।

বিশ হলো পনেরো, পনেরো এসে দাঁড়াল দশে পাত্তা নেই জেফারসন হোপের। দিনে দিনে কমে আসছে দিনের সংখ্যা, টিকি দেখা গেল না ডাকাবুকো সেই ছোকরার। বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে ঘোড়সওয়ার ছুটে গেলে অথবা গাড়ি-চালকের হাঁকডাক শুনলেই গেটের কাছে দৌড়ে আসত বৃদ্ধ কৃষক, ভাবত বুঝি এসে গেছে ত্রাতা জেফারসন। কিন্তু হাল ছেড়ে দিল যখন দেখল পাঁচ হল চার, চার থেকে তিন। আশা আর নেই, পরিত্রাণের কোনো পথ তার নেই। যে-পাহাড়ের সারি ঘিরে রেখেছে এই উপনিবেশ সে-পাহাড়ের পথ জন। ফেরিয়ারের কাছে একরকম অজানাই বলা চলে। তার ওপর সে একা। পারবে কেন অদৃশ্য অথচ সজাগ শত্রুর সঙ্গে? যে-রাস্তায় যানবাহন পথচারীর ভিড় বেশি, চার বয়স্কর হুকুমে সেইখানেও এখন পাহারা মোতায়েন হয়েছে, অনুমতি ছাড়া বেরোনোর

পথ বন্ধ। শিরে উদ্যত খঙ্গর কোপ থেকে বাঁচবার পথ কোনোদিকেই নেই। তা সত্ত্বেও এ-রকম একটা সঙিন পরিস্থিতিতেও, আপন সংকল্পে অবিচল রইল জন ফেরিয়ার। জীবন যায় যাক, মেয়েকে জলে ফেলবে না।

একদিন রাত্রে ঘরে বসে এই সব সমস্যায় তন্ময় রয়েছে জন। সেদিন সকালে ২ সংখ্যাটির বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছে বাড়িতে। আগামী কাল দেখা দেবে ১। তার মানে নির্ধারিত সময়সীমার শেষ দিবস। তারপর কী হবে আর ভাবতে পারছে না বৃদ্ধ। অনেকরকম ছায়া-কালো আবছা আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে মনকে। নিজের প্রাণের পরোয়া সে করে না। কিন্তু তার মৃত্যুর পর মেয়ের কপালে কী আছে কেউ তা জানে না। অদৃশ্য এই জালের মধ্যে থেকে মুক্তির পথ কী কোথাও নেই? এ কী দয়ে পড়েছে জন ফেরিয়ার! নিজের অসহায় অক্ষমতার কথা ভেবে জীবনে এই প্রথম টেবিলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল দুর্দান্ত লোকটা।

কিন্তু একী? নিশীথ রজনীতে চারদিক নিথর নিস্তব্ধ। তার মধ্যে কোত্থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল না? খুব আলতোভাবে কে যেন কী আঁচড়াচ্ছে। ক্ষীণ হলেও নিশুতি-রাতে সে-শব্দ অতি স্পষ্ট। শব্দটা আসছে সদর দরজা থেকে। হল ঘরে বেরিয়ে এসে কান পেতে শুনতে থাকে ফেরিয়ার। কিছুক্ষণ বিরতি। তার পরেই অতি ক্ষীণ, কপট শব্দটা নতুন করে ধ্বনিত হল দোরগোড়ায়। দরজার কাঠে কে যেন অতি সন্তর্পণে টোকা মারছে। গুপ্ত বিচারালয়ের মৃত্যুদণ্ড দিতে গুপ্তঘাতক আসেনি তো? শেষ দিনের সংখ্যা লিখতেও কেউ আসতে পারে। জন ফেরিয়ার আর সহ্য করতে পারল না। পল অনুপলের এই ধিকি ধিকি উৎকণ্ঠায় স্নায়ু ধ্বংস করার চাইতে একেবারেই সব শেষ

হয়ে যাক। লাফিয়ে গিয়ে এক ঝটকায় খিল নামিয়ে লাথি মেরে দরজা দু-হাট করে দিল জন ফেরিয়ার।

বাইরে বড়ো শান্তির রাজ্য। নিথর নিস্তব্ধ। আকাশ পরিষ্কার, রজনী নিরুপদ্রব গগনে তারার ঝিকিমিকি। বেড়া আর ফটক নিয়ে ঘেরা ছোট্ট বাগানে কেউ নেই। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিয়ে পায়ের দিকে চোখ নামাতেই জন চমকে উঠল বিষমভাবে। মুখ থুবড়ে সটান শুয়ে একটা লোক–দু-হাত ছড়ানো সামনে, পা পেছনে।

জন ফেরিয়ার এমন আঁতকে উঠল এই দৃশ্য দেখে যে আর একটু হলেও বুকফাটা চিৎকার বেরিয়ে আসত গলা দিয়ে। অতি কষ্টে দেওয়ালে হেলান দিয়ে দু-হাতে নিজের গলা টিপে ধরে চিৎকারটাকে আটকে রাখল গলার মধ্যে। প্রথমে ভেবেছিল সাংঘাতিকভাবে জখম বা মুমূর্ষু কেউ বোধ হয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে ওইভাবে। কিন্তু একটু ভালো করে দেখতে গিয়ে লক্ষ করল, অবিকল সাপের মতো নিঃশব্দে, চকিতে সাঁৎ করে ঘরের মধ্যে এঁকেবেঁকে ঢুকে পড়ল আগন্তুক এবং বাড়ির ভেতরে ঢোকার সঙ্গেসঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়ে ফিরে দাঁড়াল জন ফেরিয়ারের সামনে। সংকল্প-কঠিন ভীষণাকৃতি এই মুখের অধিকারী পৃথিবীতে একজনই আছে–জেফারসন হোপ।

জয় ভগবান। দম আটকানো গলায় বললে জন ফেরিয়ার।আচ্ছা ভয় দেখাও তো তুমি? এভাবে আসার কী দরকার ছিল শুনি?

ভাঙা গলায় বললে হোপ আগে কিছু খেতে দিন। আটচল্লিশ ঘণ্টা পেটে দানাপানি দেওয়ারও সময় পাইনি। বলতে বলতে লাফ দিয়ে গিয়ে বসল টেবিলে। ফেরিয়ারের রাতের খাবার তখনও সাজানো। গোগ্রাসে গিলতে লাগল ঠান্ডা মাংস আর রুটি। পেটের জ্বালা কমবার পর বললে, লুসি ভালো আছে তো?

আছে। কী বিপদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছি, ও তা জানে না।

শাবাশ। এ-বাড়ির চারদিকেই পাহারা। সেইজন্যেই আসতে হল এইভাবে। চোখ ওদের ছুঁচের মতো ধারালো হতে পারে, কিন্তু ওয়াশু শিকারীকে ধরার মতো চোখ ওদের নেই।

এইরকম একজন অনুরক্ত স্যাঙাতকে পাশে পেয়ে নিমেষে চাঙা হয়ে উঠল জন ফেরিয়ার। জেফারসনের দড়ির মতো পাকানো হাত চেপে ধরে বললে আবেগ ভরে, এই দুর্দিনে পাশে দাঁড়ানোর মতো কেউ আজ নেই–তুমি ছাড়া। তমার জন্যে সত্যিই আমার গর্ব হয়।

আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আপনার জন্যে তো এই বিপদে মাথা গলাইনি আমি– এসেছি লুসির জন্যে। তার গায়ে আঁচ লাগলে জানবেন হোপ ফ্যামিলির একজনের লাশ পড়ে থাকবে এই উটায়।

কী করা যায় বল তো?

কালকেই শেষ দিন। আজ রাতে না-বেরোতে পারলে আর পারবেন না। ইগল র্যাভিনে একটা অশ্বতর আর দুটো ঘোড়া বেঁধে রেখে এসেছি। সঙ্গে কত টাকা আছে আপনার?

মোহরে দু-হাজার ডলার, নোটে পাঁচ হাজার।

ওতেই হবে। সমান টাকা আমার কাছেও আছে! পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে কার্সন সিটি° যাব ঠিক করেছি! লুসিকে জাগান। ভাগ্যিস চাকরবাকর বাড়ির ভেতরে ঘুমোয় না।

ফেরিয়ার গেল মেয়েকে জাগাতে। সেই ফাঁকে হাতের কাছে যা পেল, তাই দিয়ে খাবারদাবারের একটা পোঁটলা বাঁধল জেফারসন। জল নিল পাথরের কুঁজোয়। পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরে বলেই সে জানে পথে কুয়োর সংখ্যা খুব বেশি নেই। থাকলেও খুব দূরে দূরে। পোঁটলাপুটলি বাঁধা শেষ হতে-না-হতেই মেয়েকে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরিয়ে নিয়ে এসে গেল ফেরিয়ার। সময় খুব কম। প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। কিন্তু কাজ অনেক। তাই দীর্ঘ বিরহের পর দু-জনের আবেগ উষ্ণ মিলন সাঙ্গ হল সংক্ষেপে।

এক্ষুনি বেরোতে হবে। শান্ত, কিন্তু দৃঢ় স্বর জেফারসন হোপের। বিপদের গুরুত্ব সে উপলব্ধি করেছে, বুককেও সেই অনুপাতে শক্ত করে তুলেছে। ওরা নজর রেখেছে সদর দরজা আর খিড়কির দরজায়। কিন্তু পাশের জানালা দিয়ে খেতের মধ্যে যাওয়া যাবে। রাস্তায় পৌঁছে আরও দু-মাইল গেলেই র্যাভিন ঘোড়া রয়েছে সেখানে। ভোর নাগাদ পাহাড়ের মাঝামাঝি পৌঁছে যাব।

যদি পথ আটকায়? ফেরিয়ার শুধোয়।

হোপের হাফ হাতা হাঁটু পর্যন্ত ঝোলানো ঢিলে পোশাকের সামনে উঁকি দিচ্ছিল রিভলবারের কুঁদোটা। সস্নেহে তাতে চাপড় মেরে বলল নূর হেসে, দলে ভারী থাকলে দু-তিন জনকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

বাড়ি সব আলো নেভানো। অন্ধকার জানলা দিয়ে পাশের খেতের দিকে তাকাল জন ফেরিয়ার। এ-খেত তার নিজের। কিন্তু জন্মের মতো ছেড়ে যেতে হবে আজ। অবশ্য অনেকদিন ধরেই সব ফেলে যাওয়ার জন্যে মনকে সে তৈরি করেছে। মেয়ের সুখ আর সম্মানের জন্য সমস্ত সম্পদ জলাঞ্জলি দিতেও সে প্রস্তুত। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল সুখ আর শান্তির ছবি। ঝিরঝির করে বাতাস বইছে গাছের মধ্যে দিয়ে। মর্মরধ্বনি আর দুরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের কোথাও এতটুকু মৃত্যুর কালো ছায়া নেই। আঁচ করাও যায় না কৃপাণ নিয়ে গুপ্তঘাতকের দল ওত পেতে রয়েছে আশেপাশে রক্তস্রোতে এই সুন্দর দৃশ্য কলঙ্কিত করার জন্যে। জেফারসনের নীরক্ত দৃঢ়সংবদ্ধ মুখেই কেবল আসছে সেই লক্ষণ–তারা আছে—আশেপাশে ঘাপটি মেরে রয়েছে–আসবার পথে স্বচক্ষে তা দেখেছে বলেই মাথা তার এত ঠান্ডা।

সোনার মোহর আর নোটের থলি ঘাড়ে নিল ফেরিয়ার, জেফারসন নিল জলের কুঁজো আর খাবারের পুঁটলি। লুসি নিল নিজের খুব দামি আর দরকারি কিছু জিনিসপত্রের একটা বান্ডিল। জানালা খুলে অপেক্ষায় রইল একটা কালো মেঘে রাতের অন্ধকারে আরও নিবিড় না-হওয়া পর্যন্ত। তারার আলোও যখন ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে,

জানলা গলে নেমে এল বাগানে। হেঁট হয়ে মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ঝোঁপের আড়ালে গা ঢেকে পৌঁছোল শস্যখেতের ধারে। একটা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে এখন ঢুকতে হবে খেতের মধ্যে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দু-হাতে বাপ বেটিকে চেপে ধরে জোর করে ছায়ার মধ্যে শুইয়ে দিল শিকারি জেফারসন নিজেও শুয়ে পড়ল মাঝে–কম্পিত দেহে কিন্তু নিঃশব্দে পড়ে রইল মড়ার মতো।

মাঠেঘাটে প্রান্তরে টো-টো করার ফলে বুনো বেড়াল লিংকসের মতোই তীক্ষ্ণ কান পেয়েছে জেফারসন। মাটিতে পড়তে-না-পড়তেই একটা নিশাচর পাহাড়ি পঁাচা বিষাদ কণ্ঠে ডেকে উঠল মাত্র কয়েক গজ দূরে। সঙ্গেসঙ্গে জবাব দিল আর একটা প্যাচার ডাক–সামান্য তফাতে। তারপরেই একটা ছায়ামূর্তির আবছা দেহরেখা আবির্ভূত হল শস্যখেতের সেই ফাঁকটার মধ্যে থেকে এই ফাঁকেই চুপিসারে ঢুকতে যাচ্ছিল জেফারসন। আবার হাহাকার করে উঠল পাচার ডাক–ডাকছে ছায়ামূর্তি–সংকেতধ্বনি। আঁধারের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল আর একটা ছায়াকালো পুরুষ মূর্তি।

প্রথম জন বললে কর্তৃত্বব্যঞ্জক কণ্ঠে, কালকে মাঝরাতে–নিশাচর পাখি হুইপারউইল তিনবার ডাকবার সঙ্গেসঙ্গে।

ঠিক আছে। ব্রাদার ড্রেবারকে জানিয়ে দেব? বললে দ্বিতীয় জন।

দাও। ব্রাদার ড্রেবার যেন সবাইকে বলে দেয়। নাইন টু সেভেন।

সেভেন টু ফাইভ। একই সুরে প্রতিধ্বনি করল দ্বিতীয় ব্যক্তি। দু-দিকে সরে গেল দুজনে। শেষ কথাগুলো নিশ্চয় সংকেত আর পালটা-সংকেত। পায়ের আওয়াজ দূরে মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে বুনো বেড়ালের মতো লাফিয়ে উঠল জেফারসন। বাপ বেটিকে টানতে টানতে ঢুকে পড়ল ফাঁকটার মধ্যে এবং পুরোদমে ছুটতে লাগল হেঁট হয়ে। লুসির দম ফুরিয়ে গেলে মাঝে মাঝে পাঁজাকোলা করে তুলে নিতেও কসুর করল না।

হাঁপাতে হাঁপাতে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর একটা কথাই কেবল শোনা গেল কণ্ঠে তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি! সান্ত্রিদের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি খেয়াল থাকে যেন! তাড়াতাড়ি না-করলে বেরোতে পারব না। চটপট!

হাইরোডে পৌঁছে আরও বেগে চলল তিন মূর্তি। একবারই দূর থেকে দেখা গেল একজনকে আসতে–সঙ্গেসঙ্গে লুকিয়ে পড়ল ছায়ায়–পাছে চিনে ফেলে তাই। শহরে পৌঁছনোর আগে একটা সরু এবড়োখেবড়ো পায়ে চলা রাস্তা গিয়েছে পাহাড়ের দিকে। জেফারসনের মোড় ঘুরল সেই পথে। অন্ধকারের মাঝে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে একজোড়া খোঁচা খোঁচা পাহাড়ের চুড়ো–গলিপথ শেষ হয়েছে ইগল গিরিপথের সামনে। ঘোড়া দাঁড়িয়ে সেখানে। পথঘাট জেফারসনের নখদর্পণে। বিরাট বিরাট পাথরের চাই পাশ কাটিয়ে, একবার একটা শুকনো পাহাড়ি নদীর খাত পেরিয়ে এঁকেবেঁকে নানান দুর্গম খানাখন্দ পেরিয়ে এসে পৌঁছলো একটা নিভৃত অঞ্চলে। চারদিকে উঁচু পাথর পাঁচিলের মতো সাজানো। বাইরে থেকে দেখা যায় না। বিশ্বস্ত পশুগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে মনিবের ফিরে আসার প্রতীক্ষায়। অশ্বতরের পিঠে, বসানো হল লুসিকে। বুড়ো

ফেরিয়ার বসল দুটো ঘোড়ার একটার পিঠে, সঙ্গে রইল টাকার থলি। আর একটা ঘোড়া হাঁকিয়ে বিপজ্জনক খাড়াই পথে এগিয়ে গেল জেফারসন হোপ।

প্রকৃতির উদ্দাম মেজাজের সঙ্গে পরিচয় যার নেই, এ-পথ তাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। একদিকে হাজার ফুট মাথা তুলে রয়েছে একটা খাড়া এবড়োখেবড়ো বিরাট পাহাড়–তারও বেশি হওয়া বিচিত্র নয়। কালো, কঠিন, রক্ত-হিম করা আগ্নেয়শিলার সুদীর্ঘ থামগুলো অমসৃণ ধারালো যেন প্রস্তরীভূত অতিকায় দানবের শিলাময় পঞ্জর। আর একদিকে বিরাট বিরাট আলগা পাথরের চাই আর আজেবাজে জিনিস এমনভাবে বিক্ষিপ্ত যে এগোনো অসম্ভব। এই দুইয়ের মাঝ দিয়ে সংকীর্ণ পথটা এতই সংকীর্ণ যে মাঝে মাঝে তিনজনকে সামনে পেছনে লাইন দিয়ে যেতে হচ্ছে–পাশাপাশি যাওয়া কোনোমতেই সম্ভব নয়; অভ্যেস না-থাকলে এ-পথ মাড়ানোর দুঃসাহস কারো হয় না–এগোনোর প্রশ্নই ওঠে না। তিন পলাতকের কিন্তু বুক কাঁপছে না বরং ফুর্তিতে প্রাণ নেচে উঠছে। যতই ঢুকছে বিষম বিপদসংকুল ভয়ংকর পথের গভীরে, ততই হালকা হয়ে যাচ্ছে বুকের পাষাণ-ভার কেননা পেছনে-ফেলে-আসা দুঃস্বপ্নসম ওই স্বৈরতন্ত্র ক্রমশই দূর হতে দূরে চলে যাচ্ছে কদম কদম এগিয়ে চলার সঙ্গেসঙ্গে।

সাধুদের এলাকা যে ফুরোয়নি, সে-প্রমাণ পাওয়া গেল অচিরে। সবচেয়ে খারাপ আর ধু-ধু বিজন অঞ্চলে পৌঁছেই আচমকা ওপরে আঙুল তুলে সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল লুসি। সরু রাস্তাটার প্রায় মাথার ওপর ঝুঁকে থাকা পেল্লায় পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বন্দুকধারী একজন সান্ত্রি, নির্মেঘ আকাশের বুকে সুস্পষ্ট তার দেহরেখা। আগুয়ান তিন মূর্তিকে সে-

ও দেখেছে। সামরিক কায়দায় হাঁক দিয়েছে–কে যায়? নিস্তব্ধ গিরিসংকটে পুরুষ কণ্ঠের সেই রক্ত-জল-করা চিৎকার ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির লহরি তুলে মিলিয়ে গেল দূরে।

জিনে ঝোলানো রাইফেলে হাত রেখে জেফারসন হোপ বললে, নেভাদার অভিযাত্রী।

অন্ধকারেও দেখা গেল বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখেছে নিঃসঙ্গ প্রহরী। জবাবটা যে সন্তোষজনক হয়নি, ঝুঁকে পড়ার ধরনেই তা সুস্পষ্ট।

কার হুকুমে?

চার বয়স্কর হুকুমে জবাব দিল ফেরিয়ার। মর্মোনদের কাছ থেকে সে জানে সান্ত্রির কাছে। মন্ত্রের মতো কাজ করে চার বয়স্কর নাম।

নাইন টু সেভেন, হেঁকে উঠল সান্ত্রি।

সেভেন টু ফাইভ, ঝটিতি জবাব দিল জেফারসন হোপ। বাগানের অন্ধকারে সংকেত আর পালটা সংকেত এখনও লেগে রয়েছে তার কানে।

যান। ঈশ্বর কৃপায় পথ নির্বিঘ্ন হোক, মাথার ওপর থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর। এখান থেকেই রাস্তা অনেক চওড়া গিয়েছে। কদম চালে আস্তে আস্তে দৌড়ে চলল তিন ঘোড়া আর অশ্বতর। পেছন ফিরতে দেখা গেল বন্দুকে ভর দিয়ে নির্নিমেষে তাকিয়ে প্রহরী।

কিন্তু আর ভয় নেই। ঈশ্বরের মনোমতো সন্তানদের সর্বশেষ পাহারায় ঘাঁটি এখন পেছনে সামনে মুক্তির পথ।

দীর্ঘ, সংকীর্ণ গিরিসংকটে সারি দিয়ে পথ চলতেই গেল সারারাত। পথ কোথাও নেই, কোথাও আলগা পাথর সমাকীর্ণ থাকায় অত্যন্ত বিপজ্জনক! দিকভ্রম ঘটল কয়েকবার, রাস্তা গেল গুলিয়ে। কিন্তু পাহাড়ি পথের অলিগলি মুখস্থ থাকায় পথ আবার বের করে নিল জেফারসন হোপ। ভোর হল। চোখের সামনে ভেসে উঠল আশ্চর্য কিন্তু বন্য সৌন্দর্য-দৃশ্য। যেদিকে দৃষ্টি যায়, কেবল পাহাড় আর পাহাড়। বরফ-ছাওয়া চুড়োর মালা বেঁধে রাখতে চাইছে যেন সব দিক দিয়ে গা দিয়ে, কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে বিলীন হয়েছে দূর দিগন্তে। গা এত খাড়া যে অনেক উঁচুতে পাইন আর লার্চ গাছগুলো যেন ঝুলছে মাথার ওপর একটু হাওয়া দিলেই বুঝি খসে পড়বে ঘাড়ে। ভয়টা অমূলক নয়। দৃষ্টিভ্রমও নয়। কেননা অনুর্বর উপত্যকার সর্বত্র ছড়ানো ঝড়ে-খসে-পড়া বিরাট বিরাট গাছ আর পাথরের চাই। পথ চলা দায়। কয়েক কদম যেতে-না-যেতেই সত্যি একটা প্রকাণ্ড গোলাকার পাথর বিষম শব্দের ঢেউ তুলে হুড়মুড়িয়ে নেমে এল পাহাড়ের গা বেয়ে নিস্তব্ধ গিরিপথে সে-আওয়াজ যেন বজ্রনাদ হয়ে ফেটে পড়ল সহস্র প্রতিধ্বনির আকারে ক্লান্ত-চরণ ঘোড়াগুলো লাফিয়ে উঠল গুরু-গুরু-গুম দমাস শব্দে।

সূর্য যখন উঁকি দিল পুবের আকাশে, অরুণ আভায় একে একে উৎসবে প্রজ্বলিত মোমবাতির লালচে আভায় ঝিলমিল করে উঠল সুউন্নত পর্বতশীর্ষগুলো। আশ্চর্য সুন্দর মহান এই দৃশ্য নিমেষে সব ক্লান্তি হরণ করে নিয়ে গেল তিন পলাতকের অন্তর থেকে নব বলে বলীয়ান হয়ে এগিয়ে চলল আরও সামনে। একটু পরে পৌঁছোল একটা

খরস্রোতা নদীর পাড়ে। পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে বইছে জলের ধারা। ঘোড়াগুলোকে জল খেতে দিয়ে নিজেরাও চটপট প্রাতরাশ সেরে নিলে। লুসি আর ফেরিয়ারের ইচ্ছে ছিল আরও একটু জিরোনার কিন্তু ক্লান্তি নেই জেফারসনের। এখানে নয়, এখানে নয়, ওরা এসে পড়তে পারে। তাড়াতাড়ি যেতে না-পারলে প্রাণে বাঁচব না খেয়াল রাখবেন। কার্সনে ঢুকে যত খুশি জিরোবেন সারাজীবন জিরোবেন। কেউ আর ছুঁতে পারবে না। এ ছাড়া আর কথা নেই ওর মুখে।

কাজেই সারাদিন দীর্ঘ, সংকীর্ণ গিরিসংকট বেয়ে এগিয়ে চলল তিন মূর্তি। রাত হল। হিসেব করে দেখা গেল, শত্রুরা এখন কম করেও তিরিশ মাইল পেছনে। খাড়াই পাথরের গা থেকে প্রকাণ্ড পাথর কার্নিশের মতো ঝুলছিল পথের ওপর। ঠান্ডা কনকনে বাতাসের ঝাঁপটা সেখানে কম। নিরাপদ সেই জায়গাটিতে রাত কাটাল প্রাণের ভয়ে পলাতক তিন অভিযাত্রী–গা ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পরস্পরের গায়ের গরমে শীত নিবারণ করল কোনোমতে। কয়েক ঘন্টা ঘুমিয়ে ভোরের আলো ফোটবার আগেই ফের শুরু হল যাত্রা। পেছনে এখনও কাউকে দেখা যায়নি। একটু একটু করে আশা জাগতে লাগল জেফারসনের অন্তরে। আর বোধ হয় পেছনকার ওই ভয়ংকর সংগঠন ওদের নাগাল ধরতে পারবে না। বেচারা! শত্রুর স্বরূপ ও আঁচ করতে পারেনি। ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারেনি ভয়াবহ ওই সংগঠনের লৌহমুষ্টি কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং কত সহজে ওদের কবজায় এনে পিষে শেষ করে দিতে পারে।

পলায়নের দ্বিতীয় দিবস। সূর্য যখন মধ্য গগনে, দেখা গেল সামান্য ভাড়ার প্রায় নিঃশেষিত। তাতে ঘাবড়াল না শিকারি জেফারসন। কেননা পাহাড়ে শিকার করার মতো

জন্তুর অভাব নেই। এর আগেও এইভাবেই সে ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে রাইফেলের দৌলতে। পাহাড়ের খাঁজে শুকনো ডালপালা জড়ো করে জ্বালাল একটা ধুনি। গা গরম করা দরকার আগুনের তাতে। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার ফুট উঁচু এই অঞ্চল। কনকনে হাওয়ায় যেন ছুরির ধার। ঘোড়াদের দড়ি দিয়ে বাঁধল, লুসির কাছে বিদায় নিল, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিকারের সন্ধানে। পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে দেখলে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন, বাপ বেটিতে উবু হয়ে বসে আছে আগুনের পাশে, নিস্পন্দদেহে দাঁড়িয়ে আছে ঘোড়া আর অশ্বতর। তারপর পাহাড়ের আড়ালে যেতে যেতে এ-দৃশ্য হারিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

মাইল দুয়েক পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে গেল হোপ। পেরিয়ে এল গভীর সংকীর্ণ গিরিসংকটের পর গিরিসংকট। বধ করার মতো শিকার পেল না। অথচ গাছের ছালে আঁচড়ের চিহ্ন, আর রাস্তায় অন্যান্য বহু লক্ষণ দেখে বুঝল জায়গাটাকে ভালুকের রাজ্য বললেই চলে। ঘণ্টা দু-তিন বৃথা অন্বেষণের পর ভাবছে এবার ফেরা যাক, এমন সময় বুকটা নেচে উঠল ওপরে দৃষ্টি যাওয়ায়। তিন চারশো ফুট ওপরে একটা উগত শিখরের কিনারায় ভেড়ার মতো দেখতে একটা জন্তু দাঁড়িয়ে—দু-দুটো ধারালো অস্ত্রের মতো প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং উঁচিয়ে রয়েছে মাথার ওপর। ভেড়ার পাল চলেছে হয়তো ওই শিংয়ের পেছন পেছন—শিকারির চোখে এখনও তা অদৃশ্য। চলেছে অবশ্য উলটো দিকে–হোপকে দেখতে পায়নি। পাহাড়ে গা মিলিয়ে শুয়ে পড়ল হোপ, অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যস্থির করল, তারপর টিপল ট্রিগার। শূন্যে ছিটকে গেল চতুষ্পদ–ঢালু পাহাড়ের গা বেয়ে দুমদাম শব্দে গড়িয়ে গেল নীচের উপত্যকায়।

এত বড়ো জানোয়ারকে তো আর ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া যায় না! তাই নিতম্ব কোমর আর পাঁজরা থেকে বেশ খানিকটা মাংস কেটে নিল জেফারসন। দ্রুত পা চালাল আস্তানার দিকে সন্ধের আর দেরি নেই। গোধূলি শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েক পা যেতে-না-যেতেই বুঝলে অসুবিধেটা কোথায়। শিকারের নেশায় হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে চেনাজানা গিরিসংকট পেরিয়ে এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে এখান থেকে রাস্তা চিনে নেওয়া মুখের কথা নয়। উপত্যকাটা থেকে অনেকগুলো গিরিসংকট বেরিয়ে গিয়েছে চারিদিকে, প্রত্যেকটাই দেখতে প্রায় একইরকম, আলাদা করে বিশেষ একটিকে মনে রাখা যায় না। কী আর করা যায়; একটা গিরিসংকট ধরে ধরে মাইলখানেক যাওয়ার পর এমন একটা খরস্রোতা পাহাড়ি নদীর ধারে। এসে পৌঁছলো যা সে আগে দেখেনি। পথ গুলিয়েছে বুঝতে পেরে ফিরে এসে এগোল আর একটা গিরিসংকট ধরে পরিণাম সেই একই। এদিকে দ্রুত রাত বাড়ছে। চারদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আগেই পৌঁছল একটা পরিচিত গিরিবর্ত্মে। চেনা হলেও কালঘাম ছুটে গেল এগোতে গিয়ে। চাদ এখনও ওঠেনি, অথচ দু-পাশের ঘোর অন্ধকারে সব কিছুই অস্পষ্ট। কোথায় চলেছে কিছুই বুঝছে না জেফারসন। কাঁধে মাংসের বোঝা, চরণে অসীম ক্লান্তি; তা সত্ত্বেও অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে এগিয়ে চলেছে লুসির জন্য অনেক খাবার বাকি যাত্রাপথ আহার্যর অভাব আর হবে না। প্রতিটি অবসন্ন পদক্ষেপে দূরত্ব কমিয়ে আনছে তার আর লুসির মধ্যে।

এসে গেছে আর একটা গিরিসংকটের প্রবেশমুখ। এই গিরিসংকটেই বাপবেটিকে ধুনি জ্বালিয়ে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল সে। অন্ধকারেও খাড়াই পাহাড়ে শিখরদেশ চেনা গেল। পাঁচ ঘণ্টা হল বেরিয়েছে জেফারসন। নিশ্চয় উদবেগে ছটফট করছে। আনন্দের চোটে

দু-হাত মুখের ওপর জড়ো করে খুশির ডাক ছাড়ল জেফারসন পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে সেই ডাক ঘুরতে লাগল গিরিবক্ষে–সে যে ফিরে এসেছে এই তার সংকেত। একটু বিরতি দিল পালটা ডাক শোনার আশায়। কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। নিজের ডাকই অসংখ্য প্রতিধ্বনি হয়ে বার বার আছড়ে পড়ল কর্ণকুহরে। নিস্তব্ধ, বিজন গিরিসংকটের বুক যেন বিদীর্ণ হয়ে গেল একই চিৎকারের সহস্র প্রতিধ্বনিতে। আবার চেঁচায় জেফারসন, এবার আরও জোরে, আবার নিজের ডাকই ছোটোবড়ো সরু মোটা কর্কশ কোমল প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে–ফেলে-যাওয়া সঙ্গীদের ফিসফিসানিও শোনা যায় না ধারেকাছে দুরে নিকটে। একটা নামহীন আতঙ্কে পঙ্গু করে তোলে জেফারসনের সমস্ত সত্তা। কাঁধের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্তের মতো ছুটে চলে সামনে।

মোড় ঘুরেই দেখা যায় জায়গাটা। পাঁচ ঘণ্টা আগে আগুন জ্বলছিল সেখানে দাউ দাউ করে। ছাইচাপা আগুন এখনও দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ওর যাওয়ার পর থেকে আগুনে আর নতুন কাঠ পড়েনি। শ্মশান নৈঃশব্দ্যে নিশ্চুপ চারিদিক–হাওয়া পর্যন্ত রুদ্ধকণ্ঠ। যা ভয় করেছিল জেফারসন, শেষকালে তাই সত্যি হল। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োতে দৌড়োতে নেমে এসে দেখল পুরুষ, নারী, পশু–সব উধাও, অগ্নিকুণ্ডের পাশে জীবিত কোনো প্রাণী নেই। সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটছে জেফারসন না-থাকার সময়ে ভয়ংকর সেই বিপর্যয় একাধারে গ্রাস করেছে ওদের সবাইকে রেখে যায়নি কোনো চিহ্ন।

আঘাতটা আকস্মিক। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল জেফারসন হোপ কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হতচকিত। রাইফেলে ভর দিয়ে না-থাকলে মাথা ঘুরে পড়েও যেত। তবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকার পাত্র সে নয়–যার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে বিচ্ছুরিত কর্মচাঞ্চল্য এভাবে

হাবাগোবার মতো দাঁড়িয়ে থাকা তাকে সাজে না। অচিরে সাময়িক অসহায়তা কাটিয়ে উঠল জেফারসন। আধপোড়া একটা কাঠ তুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলে ধূমায়িত অগ্নিকুণ্ডে ফুঁ দিয়ে বাড়িয়ে দিল আগুন। লকলকে শিখার আলোয় শুরু করল ছোট্ট শিবির পর্যবেক্ষণ। অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের ছাপ রয়েছে জমিতে। যেন অশ্বারোহীদের বিরাট একটা দল পলাতকদের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সল্টলেক সিটির দিকে অশ্বারোহীরা ফিরে গিয়েছে। পলাতকদের কাবু করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কি? নিশ্চয় তাই হয়েছে। মনে মনে প্রায় এই বিশ্বাসই এনে ফেলেছে জেফারসন হোপ, এমন সময়ে শরীরের প্রতিটি স্নায়ু চনমন করে উঠল একটা জিনিস দেখে। একটু দূরেই ছোট্ট একটা ঢিবি দেখা যাচ্ছে। লালচে রঙের মাটির ঢিবি। এ-ঢিবি কিন্তু আগে ছিল না। সদ্য খোঁড়া কবর–দেখেই বোঝা যায়। কাছে যেতে দেখা গেল একটা লাঠি পোঁতা রয়েছে–লাঠির ডগাটা ছুরি দিয়ে চিরে ফাঁক করে এক টুকরো কাগজে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে। কাগজের বয়ান অতি সংক্ষিপ্ত! কিন্তু সুস্পষ্ট :-

জন ফেরিয়ার
সল্টলেক সিটির পূর্বতন বাসিন্দা
মৃত্যু ৪ অগাস্ট, ১৮৬০

এই তো কিছুক্ষণ আগে দুর্মদ বুড়োকে আগুনের ধারে বসিয়ে মাংসের খোঁজে বেরিয়েছিল জেফারসন। বৃদ্ধ আর নেই আছে কেবল কবরের ওপর ঝোলানো এই কাগজটুকু। পাগলের মতো আশপাশ খুঁজল হোপ আর একটা কবর দেখবার আশায়। কিন্তু পেল না। লুসিকে তাহলে শয়তানরা ঘোড়ায় চাপিয়ে নিয়ে গেছে। এতটা পথ পেছন পেছন

এসেছিল ওকে বিয়ের যুপকাষ্ঠে বলি দেওয়ার জন্যে নিয়েও গেছে ভয়ংকরের দল সেই উদ্দেশ্যে বয়স্ক-পুত্রদের হারেমে ঢোকানোর জন্যে। নিয়তিকে ঠেকানোর ক্ষমতা নেই জেফারসনের। অসহায় সে বড়ো অসহায়। আর কেন বৃদ্ধ ফেরিয়ারের পাশে তারও যদি একটা কবর খোঁড়া থাকত–শান্তি মিলত এই দুঃখেও।

মানুষ হতাশ হলেই রাজ্যের কুঁড়েমিতে তাকে পেয়ে বসে। কিন্তু জেফারসনের রক্তে নাচছে অদম্য কর্মস্পৃহা হাত পা গুটিয়ে থাকা তার ধাতে নেই। তাই গা-ঝাড়া দিয়ে আলসেমি আর নৈরাশ্যকে বিদেয় করল ত্রিসীমানা থেকে। কিছু আর না-করার থাকলেও একটা পথ এখনও খোলা আছে–প্রতিহিংসা। রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যেই জীবন কেটেছে তার। রেড ইন্ডিয়ানদের মতোই দুর্জয় মনোবলের সঙ্গে ওতপ্রা‌োতভাবে মিশে গিয়েছে অনমনীয় প্রতিশোধস্পৃহা। ধৈর্য তার অসীম, সহিষ্ণুতা অতুলনীয়, প্রতিহিংসাকামনাকে জিইয়ে রাখার ক্ষমতাও অপরিসীম। লেলিহান অগ্নিশিখার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সমগ্র সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করলে এই মহাশোককে সে সেইদিনই ভুলতে পারবে যেদিন স্বহস্তে নিধন করবে শত্রুদের–দেবে কুকর্মের চরম শাস্তি। আজ থেকে ওর অটল সংকল্প আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়োজিত হোক সেই অভিলক্ষে। রক্তশূন্য কঠোর মুখে ফিরে গেল মাংসের বোঝা যেখানে ফেলে এসেছিল সেইখানে, আগুনে কাঠ গুঁজে রান্না করল সেই মাংস যাতে বেশ কয়েকদিন চলে যায়। পুঁটলিতে রান্না মাংস নিয়ে চরম ক্লান্তিকে তুচ্ছ করে সেই মুহূর্তে রওনা হল ফেলে আসা পাহাড়ি পথে অ্যাভেঞ্জিং অ্যাঞ্জেলসের সন্ধানে।

ঘোড়ায় চড়ে যে-গিরিসংকট পেরিয়ে এসেছিল হোপ, পায়ে হেঁটে পাঁচদিন ধরে অতিকষ্টে সেই পথেই ফিরে এল সে। পা কেটে রক্ত পড়তে লাগল পাথরের খোঁচায়–তবুও থামল না। রাত হলে পাহাড়ের খাঁজে যেখান-সেখানে শুয়ে ঘুমিয়ে নিত কয়েক ঘণ্টা–ভোরের পাখি ডাকার সঙ্গেসঙ্গে শুরু করত পদ অভিযান। ষষ্ঠ দিনে এসে পৌছাল ইগল গিরিসংকটে–এখন থেকেই শুরু হয়েছিল ভাঙা কপালে অভিযান। সাধুদের শহর এখান থেকে দেখা যায় অনেক নীচে। শরীর আর বইছে না; দাঁড়িয়ে থাকতেও পারছে না। নিঃসীম অবসাদ সত্ত্বেও রাইফেলে ভর দিয়ে খাড়া রইল জেফারসন–দীর্ঘ শীর্ণ হাতে ঘুসি নিক্ষেপ করল পায়ের তলায় দিগন্ত বিস্তৃত নিস্তব্ধ শহরের উদ্দেশে। দেখল কয়েকটা মূল সড়কে পতাকা উড়ছে, উৎসবের আরও অনেক চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ এত উৎসব কীসের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে হোপ, এমন সময় কানে ভেসে এল অশ্বখুরধ্বনি। সটান ওর দিকেই আসছে একজন অশ্বারোহী। কাছে আসতেই চিনতে পারল মুখটা। নামটা কুপার মর্মোন। অতীতে এর অনেক কাজ করে দিয়েছে হোপ। তাই ঠিক করল লুসি ফেরিয়ারের মন্দ কপালে শেষপর্যন্ত কী সর্বনাশ ঘটেছে তা জানতে হবে কুপারের মুখে। এগিয়ে গেল সামনে।

বললে, আমি জেফারসন হোপ। মনে পড়ে?

অকপট বিস্ময়ে চেয়ে রইল কুপার। অতীতের যৌবন রসে টলমল দুরন্ত সেই যুবক। শিকারির এই হাল হয়েছে? মুখ সাদা, ভীষণ। চোখ দুটি উদ্রান্ত। জামাকাপড় তো নয়, যেন ছেড়া ন্যাকড়া। চুল উশকোখুশকো। আপাদমস্তক কালিমাময়। সব মিলিয়ে ভয়ংকর

দর্শন। চিনতে কষ্ট হলেও সেই জেফারসন হোপই বটে। চেনবার পর কিন্তু বিস্ময় তিরোহিত হল কুপারের মুখচ্ছবি থেকে বিষম আতঙ্ক প্রকটিত হল চোখে-মুখে।

বললে চাপা স্বরে, তোমার মাথা কি খারাপ হয়েছে? এখানে এসেছ কেন? পরোয়ানা বেরিয়ে গেছে তোমার নামে। কেরিয়ারদের ভাগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে কেন? রেহাই নেই তোমার। চার বয়স্ক খুঁজছে তোমাকে। তোমার সঙ্গে এখন আমার কথা বলাও বিপদ আমার প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে।

কারো তোয়াক্কা করি না আমি–পরোয়ানার ভয় আমাকে দেখিয়ো না। কুপার, বন্ধুত্ব আমাদের অনেকদিনের। ঈশ্বরের নামে বলছি, যা জান, সব বল। নিশ্চয় তুমি অনেক খবর রাখ। আমার কথা রাখ, আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাও। না বোলো না।

বিড়ম্বিত স্বরে মর্মোন বললে, বল কী বলবে। তাড়াতাড়ি করো। এখানে পাথরের কান আছে, গাছের চোখ আছে।

লুসি ফেরিয়ার কোথায়?

ড্রেবার ছোকরার হারেমে বিয়ে হয়ে গেল কালকে। আরে, আরে, পড়ে যাবে যে! শরীরের আর কিছুই রাখোনি দেখছি।

ক্ষীণ স্বরে হোপ বললে, ঠিক আছি আমি, বলতে বলতে বসে পড়ল পাথরের ওপর। বিয়ে হয়ে গেছে?

গতকাল হয়ে গেল। এনডোমেন্ট হাউসে ফ্ল্যাগ উড়ছে ওই কারণেই। কার বউ হবে লুসি ফেরিয়ার, এই নিয়ে টক্কর লেগেছিল ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের দুই ছেলের মধ্যে। তোমাদের পেছনে যারা ছুটছিল, ওরা দুজনেই ছিল সেই দলে। লুসির বাবাকে গুলি করে মারে স্ট্যানজারসন, তাই তার দাবি বেশি, কিন্তু মিটিং-এ শেষ পর্যন্ত ড্রেবারের দল ভারী দেখা গেল; অবতার তাই ওকেই দিয়েছে লুসিকে। তবে বেশিদিন ভোগ করতে পারবে না কেউই। মৃত্যুর ছবি দেখে এসেছি মেয়েটার মুখে। মেয়ে বলে আর মনেই হয় না– যেন প্রেতিনি। চললে নাকি?

উঠে দাঁড়িয়েছিল জেফারসন। মার্বেলে খোদাই মুখে দুই চোখে নরকের আগুন জ্বালিয়ে বজ্রকঠিন স্বরে বললে, হ্যাঁ চললাম। মুখের পরতে পরতে ফুটে উঠল দুর্জয় সংকল্প।

যাচ্ছ কোথায়?

কী হবে জেনে? কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে নিয়ে বন্য জন্তু অধ্যুষিত ভয়ংকর পাহাড়ের মধ্যে ফিরে গেল জেফারসন হোপ–সেই মুহূর্তে ওর চাইতে হিংস্র, বিপজ্জনক কোনো প্রাণী অবশ্য ও-তল্লাটে আর ছিল কিনা সন্দেহ।

কুপারের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। বাপের ভয়ংকর মৃত্যুর জন্যই হোক, কি নিজের ঘৃণিত বিয়ের জন্যই হোক, বিছানা ছেড়ে আর মাথা তুলতে পারল না লুসি। মারা গেল এক মাসের মধ্যেই। পানোন্মত্ত স্বামীরত্নের বিন্দুমাত্র বিকার দেখা গেল না সেজন্যে। বিয়েটা করেছিল স্রেফ জন ফেরিয়ারের সম্পত্তির লোভে। সেটা তো হাতে এসে গেল। কিন্তু অন্য বউরা মড়া নিয়ে বসে রইল সারারাত কবর দেওয়ার আগের রাত এইভাবেই কাটাতে হয় মর্মোন প্রথা অনুযায়ী। কফিন ঘিরে বসে থাকার সময়ে শেষরাতে একটা আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল! আচমকা দড়াম করে খুলে গেল ঘরের দরজা। ছেড়া ন্যাকড়ার মতো পোশাক পরা রোদে-পোড়া বর্বর চেহারার একটা পুরুষ মূর্তি ধেয়ে এল ঘরের মধ্যে। বিষম ভয়ে কাঠ হয়ে গেল মেয়েরা। প্রেতচ্ছায়ার মতো সেই বিকট পুরুষ আতঙ্ক-স্তম্ভিত মেয়েদের দিকে তাকিয়ে হনহন করে হেঁটে গেল কফিনে শোয়ানো লুসি ফেরিয়ারের পাশে। শ্বেতশুভ্র নিথর নিস্তব্ধ যে-দেহে একদা লুসি নামে একটি মেয়ে বাস করত, সেই দেহের তুহিন শীতল ললাটে ঠোঁট চুইয়ে এক ঝটকায় আঙুল থেকে টেনে নিলে বিয়ের আংটিটা। দংষ্ট্রা-বিকশিত বীভৎস কণ্ঠে বললে... কবরে যাবে না এ-আংটি বলেই জ্যামুক্ত তিরের মতো ছিটকে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে বাইরে সেখান থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে–চেঁচানোর সময় পর্যন্ত পেল না মেয়েরা! আঙুল থেকে আংটিটা অদৃশ্য হয়েছে বলেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল মেয়েরা বিশ্বাসও করাতে পারল সবাইকে। এত কম সময়ে এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে ঘটতে পারে, স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন হত আংটি উধাও না-হলে।

বুকের মধ্যে প্রতিহিংসার লেলিহান অনল নিয়ে কয়েকমাস পাহাড়ে পাহাড়ে বন্য জীবনযাপন করল জেফারসন। অনেকরকম কাহিনি ছড়িয়ে পড়ল শহরে। নগরীর

উপকণ্ঠে আর নিরালা গিরিসংকটে নাকি একটা বিচিত্র ভৌতিক মূর্তিকে আজকাল প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। জানালায় দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে একদিন নাকি স্ট্যানজারসনের দিকে একটা বন্দুকের গুলি উড়ে এসেছিল শনশন করে... কপাল ভালো তাই মাথায় না-লেগে একফুট তফাতে দেওয়ালে লেগে চিড়ে চ্যাপটা হয়ে যায় বুলেটটা। আর একবার নাকি পাহাড়ে পাহাড়ে টহল দেওয়ার সময়ে আচমকা একটা বিশাল আলগা পাথর গড়িয়ে পড়ে ড্রেবারের মাথার ওপর পাশের দিকে শেষ মুহূর্তে মুখ থুবড়ে পড়ায় একচুলের জন্যে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায় সাংঘাতিক মৃত্যু। তরুণ মর্মোন দু-জন নির্বোধ নয়। অচিরেই তারা আঁচ করে নিলে ব্যাপারটা, প্রাণ হরণের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে কেউ। সদলবলে অভিযান চালানো হল পাহাড়ের মধ্যে। কিন্তু বৃথাই। টিকি দেখা গেল না জেফারসন হোপের। বার বার অভিযান চালিওে অদৃশ্য আততায়ীকে দেখা গেল না হত্যা করা তো দূরের কথা। তখন থেকে ঠিক হল বাড়ির বাইরে কখনো বেরোবে না। একলা কখনো রাস্তায় যাবে না। বাড়িতেও সবসময়ে সান্ত্রি পাহারাদার মোতায়েন থাকবে। কিছুদিন পরে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। নতুন কোনো ঘটনা আর ঘটেনি। বিচিত্র শত্রুর ছায়াও নাকি আর কারো চোখে পড়েনি। সময়ে মহাশোকও বিস্মৃত হয় মানুষ সুতরাং প্রতিহিংসার আগুনও নিশ্চয় নিভে গিয়েছে জেফারসনের মধ্যে এই ধারণা নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল দুই পাষণ্ড মর্মোন।

কিন্তু হয়েছে ঠিক তার উলটো। নেভার বদলে প্রতিহিংসার আগুন আরও বেড়েছে। অত্যন্ত কঠিন ধাতুতে তৈরি তরুণ শিকারির ভেতরটা। এ-মন ধরা দিতে জানে না, বশ মানতে পারে না, কিছুই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারে না। প্রতিহিংসা নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছে। বলেই দিনে দিনে মনের দিগদিগন্ত ছেয়ে ফেলেছে ওই একটিমাত্র

স্পৃহা–প্রতিহিংসা চাই, প্রতিহিংসা! মনের মধ্যে আর কিছুরই ঠাঁই নেই–প্রতিহিংসা স্পৃহা ছাড়া। প্রতিহিংসা পাগল হলেও কিন্তু সে অবোধ উজবুক নয়—অত্যন্ত প্র্যাকটিক্যাল ব্যবহারিক বুদ্ধি অতিশয় টনটনে। দু-দিনেই উপলব্ধি করল শরীরের ওপর অহর্নিশ এই অত্যাচার করাটা ঠিক হচ্ছে না। লৌহ কাঠামোও একদিন ভেঙে পড়বে। পুষ্টিকর খাবারের অভাবে আর চব্বিশ ঘন্টা রোদে জলে পড়ে থাকার ফলে শরীর কাহিল হচ্ছে একটু একটু করে। পাগলা কুত্তার মতো পাহাড়ের খাঁজে মরে পড়ে থাকলে প্রতিহিংসাটা নেবে কে? শত্রুপক্ষ তো তাই চায়–এইভাবেই হন্যে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে অক্কা পাক জেফারসন হোপ। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্রেফ শরীরটাকে সুস্থ সবল করার জন্যে আর অনেক টাকা জমিয়ে নতুন করে প্রতিহিংসা অভিযানে নামার জন্যে নেভাদা খনি অঞ্চলে ফেরে সে অনির্বাণ আগুন নিয়ে।

ভেবেছিল বছর খানেক থাকবে নেভাদায়। কিন্তু অপ্রত্যাশিত অনেক পরিস্থিতির ফলে থাকতে হল পাঁচ বছর। পাঁচ বছর পরেও কিন্তু মন থেকে প্রতিহিংসার আগুন যায়নি–স্মৃতি এতটুকু ফিকে হয়নি। জন কেরিয়ারের কবরের পাশে সেই স্মরণীয় রাতের তীব্র আবেগ সমানভাবেই তীব্র ছিল, তীক্ষ্ণ ছিল মনের মধ্যে মৌনী থেকেছে বাইরে, ভেতরে অহর্নিশ দাউ দাউ করে জ্বলছে প্রতিহিংসার দাবানল। ছদ্মবেশ ধারণ করে নাম পালটে ফিরে এল সল্টলেক সিটিতে ধরা পড়লে কী হবে সে-ভাবনা একবারও ভাবল না–চরম শাস্তি দিতে পারলেই হল। এসে দেখল হাওয়া ঘুরে গেছে। আবার ওর কপাল পুড়েছে। মাস কয়েক আগে ধর্ম নিয়ে মতভেদ দেখা যায় গির্জের মধ্যে। মাথা চাড়া দেয় কিছু নবীন সদস্য–বিদ্রোহ করে বয়স্কদের খবরদারির বিরুদ্ধে। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। অসন্তুষ্ট কিছু ব্যক্তির অপসারণ ঘটেছে উটা থেকে এখন তারা বিধর্মী। এদের মধ্যে

আছে স্ট্যানজারসন আর ড্রেবার! কোথায় গিয়েছে তারা কেউ জানে না। গুজব, ড্রেবার বিষয়সম্পত্তি বেচে বেশ কিছু নগদ টাকা নিয়ে যেতে পেরেছে। সে তুলনায় স্ট্যানজারসন বেচারিকে প্রায় ফকির হয়েই রাস্তায় নামতে হয়েছে। কেউ জানে না দুই মূর্তিমান এখন কোন চুলোয়।

ঘটনা যখন এইরকম মোড় নেয় এবং এহেন প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, তখন বেশির ভাগ লোকই হাল ছেড়ে দেয়। প্রতিহিংসা নেওয়ার আশা ত্যাগ করে। কিন্তু জেফারসন হোপ সে-ধাতু দিয়ে গড়া নয়। মুহূর্তের জন্যেও সে ভেঙে পড়ল না বা দ্বিধাগ্রস্ত হল না। চাকরি করার মতো যোগ্যতা তার খুবই কম। কিন্তু এই স্বল্প পুঁজি নিয়েই যুক্তরাষ্ট্রের এক শহর থেকে আরেক শহরে গিয়ে নানান রকমের জীবিকা জুটিয়ে নিয়ে অহর্নিশ খুঁজতে লাগল দুই শত্রুকে। বছর ঘুরে গেল। কালো চুল পেকে সাদা হয়ে গেল, তবুও মানুষ কুত্তার মতো নরশোণিত পিপাসা নিয়ে বিরামবিহীনভাবে অন্বেষণ করে চলল দুটি মাত্র পুরুষকে যাদের রুধিরে হাত না-ধোয়া পর্যন্ত জীবনে তার শান্তি নেই। অবশেষে পুরস্কার এল আশ্চর্য এই অধ্যবসায়ের। ওহিয়োর ক্লিভল্যান্ডে এক ঝলকের জন্যে একটা জানলায় দেখা গেল একটা মুখ। সাঁ করে মুখটা সরে গেলেও চিনে নিয়েছিল হোপ। এই মুখের খোঁজেই জীবন পণ করেছে সে! প্রতিহিংসার প্ল্যান মনের মধ্যে ছকে নিয়ে ফিরে এল দীনহীন আস্তানায়। জানলায় দাঁড়িয়ে ড্রেবারও চকিতের জন্যে রাস্তায় দেখেছিল একটা ছন্নছাড়া লোককে। চোখে তার খুনের সংকল্প। দেখেই চিনেছিল। ড্রেবার তখন রীতিমতো ধনবান, স্ট্যানজারসন তার সেক্রেটারি। দু-জনে সেই মুহূর্তে গেল পুলিশ ফাঁড়িতে। ইনিয়েবিনিয়ে জানাল, একজন পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বী ওদের দুজনকেই খুন করবে বলে পেছন পেছন ঘুরছে। সেই রাতেই হাজতে পোরা হল জেফারসন হোপকে!

জামিনের টাকা না-দিতে পারায় কয়েক সপ্তাহ হাজত বাসও করতে হল। বেরিয়ে এসে দেখলে ড্রেবারের বাড়ি শূন্য—সেক্রেটারিকে নিয়ে সে ভেগেছে ইউরোপ অভিমুখে।

নতুন করে প্রতিহিংসা-পর্বে বাগড়া পড়ল বটে, কিন্তু জেফারসন হোপকে থামানো গেল না। ঘনীভূত প্রতিহিংসা-স্পৃহা এবার ওকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। টাকার অভাবে বাধ্য হয়ে কিছুদিন গায়ে-গতরে খেটে একটি একটি ডলার জমিয়ে চলল পাথেয়-স্বরূপ। কষ্টেসৃষ্টে জীবন চলে যাওয়ার মতো টাকাকড়ি জমবার পর রওনা হল ইউরোপ অভিমুখে। দুই শত্রুর পেছন পেছন ধাওয়া করে চলল এক শহর থেকে আরেক শহরে, হাতের টাকা ফুরিয়ে গেলে কুলিমজুরের কাজ করতেও দ্বিধা করেনি দু-বেলা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে, কিন্তু একবারের জন্যেও শত্রুদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়নি। সেন্ট পিটার্সবার্গে গিয়ে শুনল প্যারিস গিয়েছে দুই মহাপাপিষ্ঠ, প্যারিস পৌঁছে শুনল এইমাত্র রওনা হয়েছে কোপেনহাগেনের দিকে। ড্যানিশ রাজধানীতে পৌঁছোতে একটু দেরি করে ফেলেছিল হোপ। দু-দিন আগেই লন্ডনে চলে গিয়েছে দুই শত্রু। লন্ডনে এসে পাওয়া গেল পাষণ্ডদের। তারপর কী ঘটেছিল, বৃদ্ধ শিকারীর নিজের জবানিতেই তা শোনা যাক। ডক্টর ওয়াটসনের খাতায় তা আনুপূর্বিক লেখা আছে, সে-খাতা থেকে শোনানো হচ্ছে এই কাহিনি।

জন ওয়াটসন এম ডি-র স্মৃতিচারণের পরবর্তী অংশ

প্রবল বাধা দেওয়ার পরেও কিন্তু আমাদের প্রতি বিন্দুমাত্র বিরূপ মনোভাব দেখা গেল না বন্দীর। বরং যখন দেখলে বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ান পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন অমায়িকভাবে জিজ্ঞেস করলে, লাগেনি তো? মারপিটের ফলে আমরা জখম হয়েছি কিনা জানবার জন্যে এই উদবেগ কিন্তু অকপট। শার্লক হোমসকে বললে, নিশ্চয় এখন থানায় নিয়ে যাবেন আমাকে। আমার গাড়ি তো নীচেই রয়েছে। পায়ের বাঁধন খুলে দিন–হেঁটে যাচ্ছি। আগে হালকা ছিলাম–এখন ভারী হয়েছি–পাঁজাকোলা করে তোলা খুব সহজ হবে না।

দৃষ্টি বিনিময় করল লেসট্রেড আর গ্রেগসন–বুকের পাটা আছে বটে বন্দীর। ধরা পড়বার পর এই প্রস্তাব কেউ করে? শার্লক হোমস কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেঁট হয়ে কথা রাখল বন্দীর। তোয়ালে দিয়ে বেঁধেছিলাম পা জোড়া খুলে ফেলে দিল তোয়ালে। উঠে দাঁড়িয়ে পা টান টান করে সে দেখে নিলে পা দুটো আবার স্বাধীন হয়েছে কিনা। বেশ মনে পড়ে লোকটার দিকে সজাগ চোখে চেয়ে থাকবার সময়ে লক্ষ করেছিলাম তার অমানুষিক কাঠামো। এ-রকম শক্তিমান পুরুষ কখনো দেখিনি। রোদেপোড়া কালচে মুখে দৃঢ় সংকল্প আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি যেন ফেটে পড়তে চাইছে দৈহিক শক্তির মতোই লোকটার মনের শক্তিও প্রচণ্ড এবং ভয়ংকর।

শার্লক হোমসের দিকে অকপট প্রশংসাভরা চোখে তাকিয়ে বললে, পুলিশ-চিফের পদ যদি খালি থাকে, আপনাকে সেখানে বসানো উচিত। আমাকে খুঁজে বার করলেন কী করে ভেবে পাচ্ছি

না।

ডিটেকটিভ দু-জনের পানে তাকিয়ে হোমস বললে, তোমরাও এসো সঙ্গে।

লেসট্রেড বললে, আমি চালাব গাড়ি। ভালোই তো! গ্রেগসন, তুমি আমার সঙ্গে গাড়ির ভেতরে থাকবে। ডাক্তার, তুমিও চলো। গোড়া থেকে কেসটায় আগ্রহ দেখিয়েছ তুমি–লেগে থাকো শেষ পর্যন্ত।

রাজি হলাম সানন্দে। দল বেঁধে নেমে এলাম নীচে। পালাবার চেষ্টা করল না কয়েদি। শান্তভাবে উঠে বসল নিজেরই গাড়ির মধ্যে আমরা উঠলাম পেছন পেছন। ওপরে গিয়ে বসল লেসট্রেড। চাবুক হাঁকিয়ে খুব অল্প সময়ে এনে ফেলল গন্তব্যস্থানে। পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল একটা ছোটো চেম্বারে। একজন পুলিশ ইনস্পেকটর লিখে নিলে কয়েদির নাম আর যাদের খুনের দায়ে তাকে ধরা হয়েছে, তাদের নাম। অফিসারের মুখ সাদা, আবেগহীন, নিরুত্তাপ। যন্ত্রবৎ কর্তব্য করে জিজ্ঞেস করল, এই সপ্তাহের মধ্যেই ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করা হবে কয়েদিকে। মি. জেফারসন হোপ, ইতিমধ্যে যদি কিছু বলতে চান বা বলতে পারেন তবে খেয়াল রাখবেন, যা বলবেন তা লিখে নেওয়া হবে এবং আপনার বিরুদ্ধে তা প্রয়োগ হতে পারে।

মন্থর কণ্ঠে কয়েদি বললে, অনেক কথাই বলার আছে আমার। সব কথাই বলতে চাই আপনাদের।

ইনস্পেকটর বললে, কোর্টে বলবেন কিনা ভেবে দেখুন।

হয়তো আমাকে আর কোর্টে যেতে হবে না। চমকে উঠবেন না। আত্মহত্যার কথা একদম ভাবছি না। আপনি কি ডাক্তার? জ্বলন্ত কালো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে শেষ প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করল কয়েদি।

বললাম, হ্যাঁ, আমি ডাক্তার।

তাহলে হাতটা এখানে রাখুন, একটু হেসে বলয় বন্দী কবজি দিয়ে দেখাল বক্ষদেশ।

হাত রাখলাম আমি। সঙ্গেসঙ্গে অনুভব করলাম বুকের খাঁচায় একটা প্রচণ্ড রকমের তোলপাড় চলছে–ধুকধুকুনি দুরমুশ পেটার মতো বেড়ে চলেছে। অপলকা বাড়ির ভেতরে শক্তিশালী ইঞ্জিন পুরোদমে চললে বাড়ির দেওয়াল যেমন মুহুর্মুহু কাঁপতে থাক, জেফারসন হোপের বুকের দেওয়াল সেইভাবে কাপছে, শিউরোচ্ছে, লাফাচ্ছে। ঘর নিস্তব্ধ বলেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম একটা চাপা গুঞ্জন, একটা অদ্ভুত ঘর-ঘর গুর গুর শব্দ উত্থিত হচ্ছে বুকের ভেতর থেকে।

সর্বনাশ! এ যে দেখছি অ্যাওরটিক অ্যানিউরিজম! ধমনী ফুলে উঠেছে, দেওয়াল আর চাপ সইতে পারছে না!

নামটা তাই বটে! প্রশান্ত স্বরে বললে জেফারসন। গত সপ্তাহে ডাক্তার দেখিয়েছিলাম। বেশিদিন আর নেই–ধমনী ফেটে যাবে যেকোনো মুহূর্তে। গত কয়েক বছর ধরে অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে। সল্টলেক পাহাড়-পর্বতে খোলা জায়গায় দিনরাত থেকেছি, না-খেয়ে দিনের পর দিন কাটিয়েছি, তারই ফল এই রোগ। কাজ শেষ এখন গেলেই বাঁচি। তবে যাওয়ার আগে যা করে গেলাম তার বৃত্তান্ত রেখে যাব। আর পাঁচটা গলা কাটার দলে যেন আমাকে ভেড়ানো না হয়।

দুই ডিটেকটিভ আর ইনস্পেকটরের মধ্যে দ্রুত পরামর্শ হয়ে গেল জেফারসনের কাহিনি এখন শোনা সমীচীন হবে কিনা—এই নিয়ে।

ইনস্পেকটর বললে, ডাক্তার, বিপদ কি এসে গেছে? অবস্থা কি খুব খারাপ?

হ্যাঁ। জবাব দিলাম আমি।

সেক্ষেত্রে আইনের স্বার্থে ওঁর কাহিনি এখুনি লিখে নেওয়া আমাদের কর্তব্য। বলুন আপনার কী বলার আছে। তবে আবার বলছি যা বলবেন, তা কিন্তু লিখে নেওয়া হবে।

বসতে বসতে কয়েদি বললে, আপনাদের অনুমতি নিয়ে বসলাম। অ্যানিউরিজম ভারি পাজি রোগ, একটুতে কাহিল হয়ে পড়ি। আধ ঘণ্টা আগে যা ধপড়াই গেছে এখনও সামলে উঠতে পারিনি। মরতে চলেছি মনে রাখবেন, এখন আর মিথ্যে বলা যায় না। যা বলব তার প্রতিটি শব্দ নির্জলা সত্য–আপনারা কীভাবে নেবেন সেটা আপনাদের ব্যাপার।

বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে অত্যাশ্চর্য কাহিনি শোনাল জেফারসন। ধীরেসুস্থে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বলে গেল একটার পর একটা ঘটনা যেন প্রতিটি ঘটনাই অত্যন্ত মামুলি–অভিনব কিছু নয়। নীচে যা লিখছি, তার প্রতিটি কথা কিন্তু জেফারসন নিজের মুখে বলেছে যেভাবে বলেছে লেখাও হচ্ছে সেইভাবে। কেননা লেসট্রেড তা লিখে নিয়েছিল নিজের নোটবইয়ে। সুতরাং বিবরণের সত্যতা সম্বন্ধে আমার গ্যারান্টি রইল।

এই দু-জনকে আমি যে কতখানি ঘৃণা করি তা আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন না। তা নিয়ে আপনাদের কিছু এসেও যায় না। শুধু জেনে রাখুন, এরা দুটি নরহত্যার অপরাধে অপরাধী। বাপকে খুন করেছিল একজন মেয়েকে আর একজন। সুতরাং বেঁচে থাকার অধিকার এদের ছিল না। খুন করেছে অনেকদিন আগে এত বছর পরে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়ে দণ্ড দেওয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমি তো জানি ওরা খুনি। তাই ঠিক করলাম আমিই হব একাধারে বিচারপতি, জুরি আর জল্লাদ। আমার জায়গায় আপনারা থাকলে এবং ভেতরে পৌরুষ থাকলে আপনারাও ঠিক তাই করতেন।

যে-মেয়েটির কথা আমি বললাম, তার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল আজ থেকে বিশ বছর আগে। কিন্তু জোর করে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওই ড্রেবারের সঙ্গে বুক ভেঙে

দেওয়া হয়েছিল পাশবিক দিক দিয়ে। মারা যাওয়ার পর তার আঙুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে দেখতে দেখতে আর মহাপাপের কথা মনে করতে করতে মরবে ড্রেবার এবং সে-মৃত্যু হবে আমারই হাতে। এই আংটি নিয়ে ড্রেবার আর ওর শাগরেদের পেছনে ঘুরেছি দু-দুটো মহাদেশ–তারপর ধরেছি এই লন্ডন শহরে। ভেবেছিলাম দেশদেশান্তরে ঘুরিয়ে জিভ বার করে দেবে আমার, যাতে বেদম হয়ে হাল ছেড়ে দিই। কিন্তু পারেনি। কাল যদি মারা যাই, যাব বলেই আমার বিশ্বাস, জেনে যাব যে-কাজ করব বলে বিশ বছর আগে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা সুষ্ঠুভাবেই করে গেলাম। এ-দুনিয়ায় ওই দু-জনের রক্তে তর্পণ করা ছাড়া আর কোনো কাজ আমার ছিল না। সে-কাজ আমি শেষ করেছি। নিজের হাতে দুনিয়া থেকে ওদের সরিয়ে দিয়েছি। আর কিছু আশা আমার নেই, বাসনাও নেই।

ওরা বড়োলোক, আমি গরিব। কী কষ্টে যে পেছন ধাওয়া করেছি, তা শুধু আমিই জানি। লন্ডন শহরে পৌঁছে দেখলাম রেস্ত বলতে কিছু নেই, কাজ-টাজ না-জোটালেই নয়। ঘোড়ায় চড়া অথবা ঘোড়ার গাড়ি চালানো আমার কাছে হাঁটা চলার মতোই সত্তায় মিশে গেছে। তাই এক গাড়ির মালিকের কাছে ধরনা দিতেই পেয়ে গেলাম চাকরি। হপ্তায় কিছু টাকা দিতে হবে মালিককে তার ওপরে যা রোজগার করব তা আমার। দিয়ে থুয়ে কিছুই অবিশ্যি থাকত না–তার মধ্যেও কষ্টেসৃষ্টে দু-বেলার খাবার জুটিয়ে নিলাম। সবচেয়ে বেগ পেলাম পথঘাট চিনতে। দুনিয়ায় যত গোলকধাঁধা আজ পর্যন্ত তৈরি হয়েছে, লন্ডন শহরের গলিখুঁজি তাদের সবাইকে টেক্কা মারতে পারে। মাথা গোলমাল করে দেয়। পাশে খোলা ম্যাপ নিয়ে গাড়ি হাঁকাতাম বলেই একটু একটু করে চিনে গেলাম মূল সড়ক আর প্রধান হোটেলগুলো। তারপর আর খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

ড্রেবার আর স্ট্যানজারসনের ঠিকানা বার করতে বেশ সময় লেগেছে। হাল ছাড়িনি। খুঁজতে খুঁজতে একদিন ঠিক করে ফেলেছি। নদীর ওপারে ক্যামবারওয়েলের একটা বোর্ডিং হাউসে উঠেছিল দু-জনে। ঠিক করলাম এবার আর চোখের আড়াল হতে দেব না। লম্বা দাড়ি রাখার ফলে এখন আর আমাকে দেখলে চেনা যায় না। ঠিকানা যখন পেয়েছি, তখন আর রক্ষে নেই। তক্কে তক্কে থাকব সুযোেগ না-আসা পর্যন্ত।

লন্ডনের যেখানেই ওরা যাক না কেন দু-জনে, ছায়ার মতো লেগে থাকতাম পেছনে! কখনো গাড়িতে, কখনো পায়ে হেঁটে। তবে গাড়িতেই বেশি সুবিধে–চোখের আড়াল হতে পারত না। খুব ভোরে অথবা গভীর রাত্রে রোজগার করতাম অতি সামান্য মালিক রেগে আগুন হল বখরা না-পেয়ে। লাঞ্ছনা মুখ বুজে সয়ে গেলাম দুই শিকারকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার আনন্দে।

দু-জনেই কিন্তু মহা ধূর্ত। পেছন নেওয়ার সম্ভাবনা আছে ভেবেছিল নিশ্চয়। তাই একলা কখনো রাস্তায় বেড়াত না, সন্ধের সময় তো নয়ই। ঝাড়া দুটো সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রতিদিন লেগে রইলাম পেছনে কিন্তু ছাড়াছাড়ি হতে দেখলাম না একবারও। অর্ধেক সময় মদে চুরচুর হয়ে থাকত ড্রেবার, কিন্তু স্ট্যানজারসনকে ঢুলতে কখনো দেখিনি। খুব ভোরে আবার অনেক রাত্রেও খরনজর রেখেছি দু-জনের ওপর ক্ষণেকের জন্যে সুযোগ পাইনি। মুষড়ে পড়িনি। কেননা মন বলছিল, সময় এবার হয়েছে। এবার আর পার পাবে না বাছাধনেরা। ভয় শুধু বুকের এই রোগটা নিয়ে। কাজটা শেষ করার আগেই ফেটে গিয়ে আমাকেই না শেষ করে দেয়।

একদিন সন্ধে নাগাদ টুর্কুয়ে স্ট্রিটে টহল দিচ্ছি গাড়ি নিয়ে এই রাস্তাতেই থাকত ওরা–দেখলাম একটা ভাড়াটে গাড়ি এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। মালপত্র ভোলা হল গাড়িতে, একটু পরেই বেরিয়ে এসে গাড়ির ভেতরে উঠে বসল ড্রেবার আর স্ট্যানজারসন, গাড়ি ছুটল সামনে। চাবুক হাঁকিয়ে আমিও ঘোড়া ছোটালাম পেছন পেছন, মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গেল। বেশ বুঝলাম, বদমাশ দুটো ফের ডেরা পালটাচ্ছে। ইউস্টন স্টেশনে ওরা নামতেই আমি একটা ছোকরাকে ডেকে আমার ঘোড়াটা দেখতে বলে ঢুকলাম প্ল্যাটফর্মে–ওদের পেছনে পেছনে। শুনলাম, লিভারপুল ট্রেনের টিকিট চাইছে। গার্ড বললে, একটা গাড়ি তো এইমাত্র ছেড়ে গেল। পরের গাড়ি? সে অনেক দেরি। মুখ শুকিয়ে গেল স্ট্যানজারসনের, কিন্তু খুশিতে ডগমগিয়ে উঠল ড্রেবার। হট্টগোলের মাঝে একদম গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলাম বলে শুনতে পেলাম প্রতিটি কথা। ড্রেবার বললে, ওর নাকি একটা ব্যক্তিগত দরকার আছে। স্ট্যানজারসন যেন একটু অপেক্ষা করে ওর জন্যে কাজটা সেরে এসে আবার একসাথে থাকা যাবেখন। বেঁকে বসল স্ট্যানজারসন। মনে করিয়ে দিলে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে দু-জনে কখনো ছাড়াছাড়ি হবে না। ড্রেবার বললে, ব্যাপারটা গোলমেলে, তাই তার একার যাওয়া দরকার। স্ট্যানজারসন কী জবাব দিল শুনতে পেলাম না। কিন্তু রাগে আগুন হয়ে যা মুখে আসে বলতে লাগল ড্রেবার। স্ট্যানজারসন যেন ভুলে না যায় সে ড্রেবারের মাইনে-করা-চাকর হুকুম দিতে যেন না-আসে। স্ট্যানজারসন আর কথা বাড়াল না! শুধু বললে, লাস্ট ট্রেন মিস করলে যেন হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে চলে যায় ড্রেবার ওখানেই থাকবে সে ড্রেবার বললে, এগারোটার আগেই ফিরে আসবে প্লাটফর্মে। বলে, বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে।

এই হল সুবর্ণ সুযোগ। এত বছর এই সুযোগের প্রতীক্ষায় থেকেছি। দুই শত্রুই এখন আমার হাতের মুঠোয়। একসঙ্গে থাকলে আমাকে রুখতে পারত, কিন্তু আলাদাভাবে পারবে না। তা সত্ত্বেও হঠকারিতা দেখালাম না–ঝোঁকের মাথায় কিছুই করলাম না। কী করব সে-প্ল্যান ঠিক ছিল অনেক আগে থেকেই। মরবার আগে যদি জানতেই না পারল কেন মরতে হচ্ছে এবং কার হাতে মারা যাচ্ছে তাহলে সে প্রতিহিংসার কোনো মানেই হয় না। তাই এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে আমার পরম শত্রু দু-জন জানবার সুযোগ পায় জীবনটা যেতে বসেছে কোন পাপের শাস্তিতে। দিন কয়েক আগে এক ভদ্রলোক ব্রিক্সটন রোডে অনেকগুলো বাড়ি দেখতে বেরিয়েছিলেন আমার গাড়িতে চেপে–ভুল করে একটা বাড়ির চাবি ফেলে যান গাড়ির মধ্যে। সেই রাতেই ভদ্রলোক চাবি ফেরত নিয়ে যান বটে, কিন্তু তার আগেই চাবির একটা ছাঁচ বানিয়ে নিয়েছিলাম। সেই ছাঁচ থেকে একটা নকল চাবিও করেছিলাম। এতবড়ো শহরে অন্তত একটা বাড়ির মধ্যে ঢোকার ব্যবস্থা করা গিয়েছিল এই চাবির দৌলতে যে-বাড়ি জনমানবশূন্য এবং নির্বিঘ্নে আমার প্ল্যান সম্পন্ন করার পক্ষে আদর্শ। ড্রেবারকে এই বাড়ির মধ্যে ঢোকানোটাই এখন সমস্যা। সমাধান হয়ে গেল সে-সমস্যারও।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে রাস্তা বরাবর হাঁটতে হাঁটতে একটার পর একটা মদের আড্ডায় ঢুকতে লাগল ড্রেবার। শেষ আড্ডাটায় রইল আধঘণ্টা। বেরিয়ে যখন এল, পা টলছে। মেজাজ শরিফ। সামনেই একটা ঘোড়ার গাড়ি দেখে উঠে বসল তাতে। আমি গাড়ি নিয়ে চললাম পেছনে এত পেছনে যে আমার ঘোড়ার নাক রইল সামনের গাড়োয়ানের গজখানেক পেছনে। এইভাবেই গেলাম সারারাস্তা; ওয়াটারলু ব্রিজ পেরোলাম। মাইলের পর মাইল রাস্তা পেছন ফেলে এলাম–তারপর চোখ কপালে উঠল যখন দেখলাম গাড়ি

এসে দাঁড়ালে সেই বাড়িতেই যে-বাড়িতে এতদিন আস্তানা নিয়েছিল দুই বন্ধু। ফিরে আসার উদ্দেশ্যটা বুঝলাম না। গাড়ি নিয়ে দাঁড়ালাম শ-খানেক গজ তফাতে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকল ড্রেবার। এক গেলাস জল দেবেন? কথা বলতে বলতে মুখ শুকিয়ে গেছে।

এক গেলাস জল দিলাম আমি–এক নিশ্বেসে গেলাস খালি করে দিল জেফারসন।

বললে, বাঁচলাম। যাই হোক, মিনিট পনেরোর মতো দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বাড়ির ভেতরে ঝটাপটির শব্দ শুনলাম। যেন মারপিট চলছে। তারপরেই খুলে গেল দরজা, ছিটকে বেরিয়ে গেল দুটো লোক–একজন ড্রেবার–আরেকজনের কম বয়স–চিনি না, কখনো দেখিনি। ড্রেবারের কলার ধরেছিল ছোকরা। সিঁড়ির মাথায় এসে এমন ঘাড়ধাক্কা আর লাথি মারল ড্রেবারকে যে রাসকেলটা ঠিকরে গিয়ে পড়ল মাঝরাস্তায়। হাতের লাঠি সাঁই সাঁই করে মাথার ওপর ঘোরাতে ঘোরাতে ছোকরা বললে তারস্বরে, কুত্তা কোথাকার! ফের যদি ভদ্রলোকের মেয়ের গায়ে পড়তে আসিস তো এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে ভুলবি না! সত্যিই হয়তো ড্রেবারকে লাঠিপেটা করে মেরেই ফেলত ছোকরা–এমন প্রচণ্ড রেগেছিল। তবে কাপুরুষ কুত্তাটা আর দাঁড়াল না–টেনে দৌড়াল মোড়ের দিকে। আমার গাড়ি দেখেই লাফিয়ে উঠে বসল ভেতরে। বললে, চলো হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেল।

গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়ার পর আনন্দের চোটে এমন বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল আমার যে ভয় হল ঘাটে এসে তরী না-ডোবে। শেষ মুহূর্তে ধমনী না-ফেটে যায়।

অ্যানিউজিমকে নিয়েই আমার যত ভয়। আস্তে আস্তে চালালাম গাড়ি, মনে মনে ভাবতে লাগলাম কী করলে এখন সবচেয়ে ভালো হয়। শহরের বাইরে নিয়ে যেতে পারি, মফস্সলে নিরালা গলিঘুজির মধ্যে ঢুকে শেষবারের মতো মুখোমুখি হই। করতাম তাই, এমন সময়ে নিজে থেকেই সমস্যাটার সমাধান করে দিল ড্রেবার। আবার মদের নেশা চাড়া দিয়েছে–বললে প্যালেসে যেতে। ভেতরে ঢোকার আগে আমাকে বলে গেল বাইরে দাঁড়াতে। অনেকক্ষণ রইল ভেতরে। বেরিয়ে এল অত্যন্ত বেহুঁশ অবস্থায়। মন বলল, এই তো সুযোগ। আর ভয় নেই। ড্রেবার এখন আমারই মুঠোয়।

ঠান্ডা মাথায় খুন করার ইচ্ছে আমার ছিল না। দয়া করে ওই জাতের খুনি ঠাওরাবেন না আমাকে। করলে অবশ্য ক্ষতি ছিল না কিন্তু ন্যায়বিচার ছাড়া আমার কোনো লাভ হত না, আমি যা করব ঠিক করেছিলাম, তা আর হত না। বিশ বছর ধরে ভেবেছি, যেদিন সুযোগ পাব, সেদিন আগে ওর পাপের চেহারাটা সামনে তুলে ধরব–এ-সুযোগ ওকে আমি দেবই। আমেরিকায় হন্যে হয়ে ওদের পেছনে ঘোরবার সময়ে ছোটো ছোটো অনেক চাকরি করতে হয়েছিল। ইয়র্ক কলেজে দারোয়ানগিরি আর ঝাড়ুদারের কাজও করেছিলাম। বিষ নিয়ে একদিন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন প্রফেসর। একটা জিনিস দেখালেন ছাত্রদের জিনিসটা নাকি একটা অ্যালকালয়েড। দক্ষিণ আমেরিকায় রেড ইন্ডিয়ানরা তীরে এ-রকম বিষ মাখিয়ে রাখে–সেই বিষ থেকে অ্যালকালয়েডটা উনি নিষ্কাষন করেছেন। মারাত্মক বিষ। এক গ্রেনেই মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে। কোন বোতলে থাকে বিষটা দেখে রেখেছিলাম। গ্লাস খালি হয়ে যাবার পর বোতল থেকে একটু ঢেলে নিয়েছিলাম। ওষুধপত্র বানাতে আমি জানি। তাই ওই বিষ দিয়ে কতকগুলো সাদা বড়ি বানালাম–যে-বড়ি সহজেই গলে যায় হুবহু ওইরকম আরও কয়েকটা বড়ি বানালাম–কিন্তু তার মধ্যে

বিষ দিলাম না। দু-রকম বড়ি রাখলাম একটা সাদা কৌটোয়। তখন থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম দুই শয়তানকে কৌটো থেকে বড়ি খাওয়াব–তারপর যা পড়ে থাকবে নিজে খেয়ে নেব। মৃত্যু আসবে নিঃশব্দে বন্দুকের মুখে রুমাল গুঁজে গুলি করলেও আওয়াজ হত–এতে কোনো শব্দই হবে না। বড়ির কৌটো তখন থেকে কিন্তু পকেটে পকেটে রাখতাম। সময় হয়েছে এবার বড়িকে কাজে লাগানোর।

ঘড়ির কাটা অনেক আগেই বারোটার ঘর ছাড়িয়েছে একটা বাজতে দেরি নেই, রাত নিশুতি, দুর্যোগ চরমে উঠেছে ঝড়ো বাতাস আর তুমুল বৃষ্টিতে রাস্তা ফাঁকা। এত আনন্দ হল আমার যে ইচ্ছে হল গলা ছেড়ে গান ধরি। জানি না আপনাদের কেউ আমার মতো পরিস্থিতিতে কখনো পড়েছেন কিনা। বিশ বছর ধরে যা চেয়েছেন, হঠাৎ যদি তা হাতের মুঠোয় পেতেন–ঠিক আমার মতোই আনন্দে নেচে উঠতেন গাড়ির ওপরেই। চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলাম স্নায়ু শান্ত করার জন্যে। কিন্তু হাত কাঁপতে লাগল সমানে—দপ দপ করতে লাগল দুটো রগ প্রচণ্ড উত্তেজনায়। লাগাম ধরে গাড়ি হাঁকিয়ে যেতে যেতে যেন স্পষ্ট দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আমার প্রাণের লুসি আর ওর বুড়ো বাপ। জন ফেরিয়ার। বিশ্বাস করুন আপনাদের যেমন দেখছি ওদেরও যেন ঠিক তেমনি দেখতে পেলাম ঝড়বাদলের সেই রাতে। ঘোড়ার দু-পাশে দু-জন ছুটছিল আর হাসছিল আমার দিকে তাকিয়ে। সমস্ত রাস্তা গেল এইভাবে। তারপর গাড়ি ঢোকালাম ব্রিক্সটন রোডে।

রাস্তা একদম ফাঁকা–কেউ নেই। বৃষ্টির ঝরঝর আওয়াজ ছাড়া কোনো শব্দও নেই। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমোচ্ছে ড্রেবার। মাতালের ঘুম। হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, সময় হয়েছে নামবার।

চলো, বললে ড্রেবার।

হোটেলে এসেছে মনে করে আর একটি কথাও না-বলে বাগান দিয়ে হেঁটে এল আমার পেছন পেছন। পাশে পাশে হাঁটতে হল বাধ্য হয়ে–নইলে টলে পড়ে যেত বাগানেই। সদর দরজার চাবি খুলে ঢোকালাম সামনের ঘরে। বিশ্বাস করুন, এখানেও বাপবেটিতে হেঁটে এল আমার সামনে। রাস্তা থেকে বাড়ির ভেতর হাসিমুখে যেন পথ দেখিয়ে আনল আমাকে।

ঘর অন্ধকার। দুমদাম পা ফেলে বললে ড্রেবার–এ যে দেখছি নরকের অন্ধকার।

আলো এখুনি ফুটবে, বললাম আমি। মোমবাতি এনেছিলাম সঙ্গে। দেশলাই বার করে জ্বালালাম। নিজের মুখে আলো ফেলে ঘুরে দাঁড়ালাম ওর সামনে। বললাম–এনক ড্রেবার, এবার বলো তো আমি কে?

মদের নেশায় ঢুলু ঢুলু লাল চোখে ক্ষণেকের জন্যে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল আপাদমস্তক। বুঝলাম, চিনেছে আমি কে। আরক্ত মুখে টলতে টলতে হেঁটে গেল কয়েক পা, দরদর করে ঘাম গড়িয়ে পড়ল কপাল বেয়ে, খটাখট শব্দে ঠোকাঠুকি লাগল দাঁতে

দাঁতে। দেখবার মতো দৃশ্য। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গলা ছেড়ে হেসে নিলাম বেশ কিছুক্ষণ। প্রতিহিংসার মতো মিষ্টি কিছু নেই, এই আমি জানতাম বরাবর। কিন্তু আত্মার শান্তি যে তার চাইতেও মিষ্টি, তা জানলাম সেই প্রথম।

বললাম–কুকুর কোথাকার! সল্টলেক সিটি থেকে তোর পেছন নিয়েছি গিয়েছি সেন্ট পিটাসবার্গ–প্রত্যেকবার পালিয়েছিস নাগালের বাইরে। আর পালাতে পারবি না। অনেক ঘুরেছিস আর তোকে ঘুরে মরতে হবে না। হয় তুই, আর না হয় আমি কালকের সূর্য ওঠা আর দেখব না। কেঁচোর মতো কুঁচকে আরও তফাতে সরে গেল ড্রেবার। মুখ দেখে মনে হল আমাকে। বদ্ধ উন্মাদ ঠাউরেছে। সেই মুহূর্তে আমি অবশ্য পাগলই হয়ে গিয়েছিলাম। দমাদম হৃদঘাত শোনা যাচ্ছিল রগের শিরায় যেন হাতুড়ি পড়ছে। নাক দিয়ে বাড়তি রক্ত বেরিয়ে না-গেলে বোধ হয় সিধে থাকতে পারতাম না–জ্ঞান হারাতাম। রক্ত বেরিয়ে যেতেই বাঁচলাম।

দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা ওর নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে গলার শির তুলে বললামলুসি ফেরিয়ারকে ভাবতে এখন কেমন লাগছে বল? ফলটা পেতে বড্ড দেরি হল রে–কিন্তু রেহাই তোর নেই। ঠোঁট কাঁপতে লাগল কাপুরুষের প্রাণ ভিক্ষা বৃথা জেনেই সে চেষ্টা করেনি—কিন্তু চোখে দেখলাম সেই অনুনয়।

বললে বিড় বিড় করে খুন করবে?

খুন? দাঁতে দাঁত পিষে বললাম আমি-খুন কীরে? পাগলা কুত্তাকে কেউ খুন করে না। পাগলা কুত্তার মতোই মারে! সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে যাকে ভালোবেসেছিলাম, যার বাবাকে কসাইয়ের মতো খুন করতে তোদের হাত কাঁপেনি, মরা বাবার কাছ থেকে হিড় হিড় করে যাকে টেনে নিয়ে গিয়ে তোর নোংরা ব্যাভিচারের হারেমে পুরেছিলি–সেই লুসির ওপর একবারও কি তুই দয়া দেখিয়েছিলিস?

চিৎকার করে বললে—-আমি মারিনি লুসির বাবাকে।

কিন্তু লুসির বুক তুই ভেঙেছিলি, কৌটোটা ওর সামনে বাড়িয়ে ধরে বলেছিলাম ভীষণ গলায়। ভগবানের বিচার আছে কিনা দেখা যাক। দুটো বড়ি আছে এতে। একটা খাবি তুই একটা আমি। একটাতে আছে মৃত্যু–একটাতে জীবন। ভগবান বলে যদি কিছু থাকে দুনিয়ায় দেখা যাক কে মরে কে বাঁচে।

বিকটভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে হাতে পায়ে ধরতে লাগল ড্রেবার কিন্তু গলায় ছুরি চেপে ধরে বড়ি খেতে বাধ্য করলাম আমি। বাকি বড়িটা খেলাম নিজে। তারপর মিনিটখানেক নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম দু-জনে দু-জনের মুখের দিকে কে বাঁচে কে মরে দেখবার জন্যে। যন্ত্রণার প্রথম অভিব্যক্তি মুখে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম বিষের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। সে-দৃশ্য আমি কোনোদিন ভুলব না। প্রথম প্রতিক্রিয়াটা দেখা গেল চোখে। দেখেই অট্টহাসি হাসতে লাগলাম। লুসির অভিশপ্ত বিয়ের আংটি চোখের সামনে নাড়তে লাগলাম। খুব বেশি সময় অবশ্য পেলাম না। অ্যালকালয়েডটার বিষক্রিয়া সত্যিই অত্যন্ত দ্রুত। প্রথমে একটা নিদারুণ যন্ত্রণায় খিচ ধরল পা থেকে মাথা পর্যন্ত, তারপর দু-হাত

সামনে ছুঁড়ে চেষ্টা করল বাতাস খামচে ধরার। পরক্ষণেই টলতে টলতে ভাঙা গলায় বীভৎসভাবে চেঁচিয়ে উঠে দড়াম করে আছড়ে পড়ল মেঝের ওপর—আর নড়ল না। পা দিয়ে চিত করে শুইয়ে হাত দিলাম বুকের ওপর। হৃৎপিণ্ড আর চলছে না। মারা গেছে ড্রেবার।

দর দর করে রক্ত পড়ছিল আমার নাক দিয়ে। হৃক্ষেপ করিনি। কী জানি তখন কেন খেয়াল হল, ওই রক্ত নিয়ে দেওয়ালে কিছু লিখে যাই। পুলিশকে ভুলপথে চালানোর জন্যেই বোধ হয় বদ বুদ্ধিটা এসেছিল মাথায়। মনে তখন ফুর্তি উপচে পড়েছে। নিউইয়র্কের একটা ঘটনা মনে পড়ল। খুন হয়েছিল একজন জার্মান। ডেডবডির ওপরে লেখা ছিল RACHE. খবরের কাগজওয়ালারা নানান কথা বলেছিল এই নিয়ে। খুনটা নাকি গুপ্ত সমিতির কীর্তি। ভাবলাম নিউইয়র্কওয়ালারা যে-ধোকায় ভোলে, লন্ডনওয়ালারাও নিশ্চয়ই সেই ধোঁকায় ভুলবে। তাই আঙুল ডোবালাম নিজের রক্তে, দেওয়ালে লিখলাম RACHE. বেরিয়ে এলাম বাইরে, গাড়িতে চেপে দেখলাম আশপাশ। কেউ নেই। রাস্তা ফাঁকা। নিশুতি রাত। কনকনে ঠান্ডা। ঝড়বাদলা একটুও থামেনি। কিছুদূর গাড়ি হাঁকিয়ে যাওয়ার পর পকেটে হাত দিয়ে দেখি লুসির বিয়ের আংটিটা নেই। মাথায় বাজ পড়ল যেন। লুসির স্মৃতি বলতে ওই আংটি ছাড়া কিছুই আর কাছে ছিল না। ড্রেবারের লাশের ওপর ঝুঁকে পড়ার সময়ে পকেট থেকে পড়ে গেছে নিশ্চয়। সঙ্গেসঙ্গে ফিরে এলাম গাড়ি নিয়ে। কপালে যাই থাকুক না কেন, ও-আংটি আমার চাই। পাশের গলিতে গাড়ি রেখে হনহন করে হেঁটে বাড়িতে ঢুকতে যাচ্ছি মুখোমুখি ধাক্কা খেলাম একজন পুলিশের চৌকিদারের সঙ্গে। পাছে সন্দেহ করে বসে এত রাতে কী করতে এসেছি ফাঁকা বাড়িতে, তাই মালের অভিনয় করে বেঁচে গেলাম সে-যাত্রা।

ড্রেবার নিধন তো হল, এবার স্ট্যানজারসনকেও যে মারতে হবে একই পন্থায়–নইলে জন ফেরিয়ারের ঋণ তো শোধ হবে না। হ্যালিডেজ প্রাইভেট হোটেলে উঠেছে জানতাম। সারাদিন ঘুর ঘুর করলাম আশেপাশে কিন্তু একবারও বাইরে এল না শয়তান। মহা ধড়িবাজ তো! নিজেকে আগলাতে জানে। নির্দিষ্ট সময়ে ড্রেবার না ফিরতেই নিশ্চয় আঁচ করেছিল বিপদ এসে গেছে। কিন্তু যত ধড়িবাজই হোক না কেন, বাড়ির বাইরে পা না-দিলেও আমার নাগালের বাইরে যে থাকা যায় না–এ-বুদ্ধি তার ঘটে ছিল না। শোবার ঘরের জানলা কোথায় দেখে নিলাম। পরের দিন কাকডাকা ভোরে মই জোগাড় করলাম পাশের হোটেল থেকে মই লাগিয়ে জানলা দিয়ে ঢুকলাম ভেতরে। ঘুম থেকে টেনে তুলে বললাম অনেকদিন আগে একটা প্রাণ হরণের জবাব দেওয়ার সময় এখন হয়েছে। ড্রেবার মরেছে কীভাবে বলবার পর বিষবড়ির কৌটো বাড়িয়ে দিলাম জীবন অথবা মৃত্যুকে বেছে নেওয়ার জন্যে। কিন্তু বাঁচবার এই শেষ সুযোগ তার মনঃপূত হল না। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে গলা টিপে ধরতে গেল আমার। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে বাধ্য হয়ে ছুরি মারলাম বুকে। বড়ি খেলেও বাঁচত না ঠিকই। ভগবানের বিচারে ভুল হয় না। ঠিক বিষ বড়িটাই মুখে পুরতে হত নিয়তির নিয়মে।

আর বিশেষ কিছু বলার নেই আমার। বলতেও পারছি না–প্রাণটা গলায় এসে ঠেকেছে। আমেরিকা ফিরে যাওয়ার জন্যে টাকা দরকার। তাই দিনকয়েক গাড়ি হাঁকিয়ে কাটালাম স্রেফ পয়সার ধান্দায়। গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির আড্ডায়, এমন সময়ে ছেড়া পোশাক পরা রাস্তার একটা ছোকরা এসে বললে জেফারসন হোপ বলে কেউ আছে কিনা। ২২১বি বেকার স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক ডেকেছেন, গাড়ি নিয়ে যেতে হবে। সন্দেহ

করার কোনো কারণ ছিল না। তাই এলাম। আসার পরেই এই ভদ্রলোক লোহার বেড়ি পরিয়ে দিল হাতে–জীবনে এমন সুন্দরভাবে হাতকড়া লাগাতে কাউকে দেখিনি। আমাকে খুনি মনে করতে পারেন আপনারা, তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ আমি জানি আপনাদের মতোই আমিও একজনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

মর্মস্পর্শী বর্ণন-ভঙ্গিমার ফলে লোমহর্ষক এই কাহিনি দাগ কেটে বসে গেল মনের মধ্যে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম প্রতিটা কথা। পোড়খাওয়া গোয়েন্দা দু-জনও দেখলাম অভিভূত হয়েছে। দু-দুটো খুনের আগাপাশতলা জানার পরও খুনির কাহিনি শোনবার জন্যে উগ্রীব হয়ে বসে আছে। কাহিনি শেষ হওয়ার পর কারো মুখে কিছুক্ষণ আর কথা ফুটল না। ঘর নিস্তব্ধ। শুধু যা খসখস ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে লেসট্রেডের পেনসিলে শর্টহ্যান্ডে শেষ ক-লাইন লিখে নিচ্ছে কর্তব্যনিষ্ঠ ডিটেকটিভ।

অবশেষে মুখ খুলল শার্লক হোমস। বলল, একটা প্রশ্ন। আমার বিজ্ঞাপনের জবাবে আংটি নিতে কে এসেছিল?

কৌতুকছলে চোখ টিপল জেফারসন হোপ। বলল, আমার ব্যাপারে শুধু আমাকে নিয়েই কথা বলা ভালো, অন্যকে টানতে চাই না। আপনার বিজ্ঞাপনটা দেখে ভাবলাম সত্যিই হয়তো কেউ কুড়িয়ে পেয়েছে আংটিটা অথবা আংটির ফাঁদ পেতে কেউ আমায় ধরতে চাইছে। আমার বন্ধুটি নিজে থেকেই আংটি আনতে চাইল। খুব ঠকিয়েছে আপনাকে, তাই না?

তা আর বলতে, আন্তরিকভাবেই বললে হোমস।

গম্ভীর মুখে ইনস্পেকটর বললে, জেন্টেলমেন, এবার তো আইনমাফিক কয়েদিকে হাজতে ঢোকাতে হয়। বেস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করব আসামিকে আপনারা দয়া করে আসবেন, সাক্ষী হতে হবে। আমার দায়িত্ব সেই পর্যন্ত। বলে ঘণ্টা বাজিয়ে দু-জন পাহারাদারকে দিয়ে আসামিকে পাঠিয়ে দিল হাজতে। আমি আমার বন্ধু বাইরে এসে ছ্যাকড়া গাড়ি চেপে ফিরে এলাম বেকার স্ট্রিটে।

বেস্পতিবার ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার তলব পেলেও বেস্পতিবার এলে পর দেখা গেল আমাদের সাক্ষী হওয়ার আর দরকার নেই। ঊর্ধ্বলোকের পরম বিচারপতি শমন পাঠিয়ে ডেকে নিয়েছেন জেফারসন হোপকে–ওপরওলার সেই বিচারালয়ে বিচার বড়ো কড়া, রায়ও বড়ো নির্ভুল। জেফারসনের বিচারের ভার তিনিই নিয়েছেন। ধরা যেদিন পড়ে, সেইদিন রাতেই ফেটে যায় জেফারসনের অ্যানিউরিজম। পরের দিন ভোরবেলা গারদের দরজা খোলার পর দেখা গেল হাসিমুখে সে শুয়ে আছে মেঝের ওপর। মৃত্যুর মুহূর্তে যেন সারাজীবনের সুষ্ঠু কর্ম নিমেষে প্রতিভাত হয়েছে মনের পর্দায় মুখ তাই নিবিড় প্রশান্তিতে সমুজ্জ্বল।

পরের দিন সন্ধ্যায় এই সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে হোমস বললে, জেফারসন ফাঁকি দিয়ে গেল বটে, কিন্তু হাত কামড়ে মরবে লেসট্রেড আর গ্রেগসন। খুব একটা জাঁকালো বিজ্ঞাপন ছেড়েছিল না?

জেফারসনের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ওদের তো তেমন হাত নেই। বললাম আমি।

তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলে বন্ধুবর, জীবনে আমরা যা করি, ফলের আশা না-রেখেই করি। লোকে জানলেই হল যে কাজটা তোমার। যাকগে, বলেই তিক্ততা ঝেড়ে ফেলে বললে খুশি খুশি গলায়, এ-তদন্তে আমার কিন্তু লোকসান হয়নি লাভই হয়েছে। সহজ হলেও

শেখবার মতো কয়েকটা ব্যাপার পেয়েছি। ঠিক এ-রকম কেস আমার বরাতে এর আগে জোটেনি।

সহজ বলছ? আমি তো অবাক।

তা ছাড়া আর কী? আমার অবাক হওয়া দেখে হাসিমুখে বললে শার্লক হোমস। কেসটা যে সহজ তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হচ্ছে কোনোরকম সাহায্য ছাড়াই স্রেফ কয়েকটা মামুলি অনুমানভিত্তিক সিদ্ধান্তের ওপর বশ করে তিন দিনের মাথায় গ্রেপ্তার করেছি আসামিকে।

তা ঠিক।

এর আগেও তোমাকে বলেছি, যা গতানুগতিক, তা অসুবিধের বদলে সুবিধেই করে দেয়। এ ধরনের ধাঁধার জবাব পাওয়ার মোক্ষম পন্থা হল পিছু-হাঁটা চিন্তাধারা। পদ্ধতিটা সোজা তো বটেই, কাজও হয় দারুণ কিন্তু কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না–চর্চাও করে না। রোজকার জীবনে আমরা সামনে হাঁটায় অভ্যস্ত বলেই উপেক্ষা করি পিছু-হাঁটা চিন্তাকে। সংশ্লেষণমূলক চিন্তা যারা করে, সেরকম পঞ্চাশজনের মধ্যে হয়তো একজন বিশ্লেষণমূলক চিন্তায় অভ্যস্ত।

তোমার কথা মাথায় ঢুকছে না।

ঢুকবে বলেও ভরসা রাখি না। আর একটু স্পষ্ট করে বলা যাক। পরপর কতকগুলো ঘটনা শোনার পর বেশির ভাগ লোকই বলতে পারে ঘটনা পরম্পরার ফলটা কী হতে পারে। ঘটনাগুলো মনের মধ্যে সাজিয়ে দিয়ে মনে মনে তর্ক করে ঠিক করে নেয় অমুক ঘটনার অমুক পরিণাম হবেই। আবার কিছু লোক আছে যাদেরকে শুধু পরিণামটা বললে তাই থেকে মনের মধ্যে যুক্তি-তর্ক দিয়ে খাড়া করে নেয় কী-কী ঘটনার ফলে এমনি একটা পরিণাম সম্ভব হতে পারে। চিন্তার এই ক্ষমতাকেই আমি বলি পিছু-হাঁটা চিন্তা বা বিশ্লেষণমূলক যুক্তি।

বুঝলাম!

এই কেসে পাওয়া গিয়েছিল কেবল পরিণামটা–কী-কী ঘটনার ফলে ওই পরিণাম হতে পারে, সব ভেবে নিতে হয়েছে মনের মধ্যে। ঠিক কী-কী ভেবেছিলাম, এবার তা বলা যাক। যুক্তির ধাপগুলো শুনলেই বুঝবে ব্যাপারটা কত সোজা। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করছি। মনে আছে নিশ্চয় বাড়িটা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম—মনকে পরিষ্কার স্লেটের মতো কঁকা রেখেছিলাম–আগে থেকে কোনো ধারণা মনে ঢুকতে দিইনি। পর্যবেক্ষণ শুরু করলাম রাস্তা থেকে। আগে বলেছি গাড়ির চাকার দাগ দেখলাম রাস্তায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এ-দাগ পড়েছে নিশ্চয় রাত্রে ! গাড়িটা যে প্রাইভেট নয়–ভাড়াটে গাড়ি, তা বুঝলাম সরু চাকার দাগ দেখে। বাড়ির গাড়ি মানে, ব্রুমের চাকা অনেক চওড়া হয় লন্ডনের ছ্যাকড়াগাড়ির চাকার চেয়ে।

এই হল প্রথম পয়েন্ট। বাগানের রাস্তায় আস্তে আস্তে হাঁটতে দেখলাম আমার কপাল ভালো। বাগানের মাটি কাদা টাইপের পায়ের ছাপ যার ওপর ফোটে ভালো। তোমার চোখে স্রেফ পাঁক মাড়িয়ে যাওয়া মনে হওয়াটা আশ্চর্য নয়। কিন্তু আমার ট্রেনিং পাওয়া চোখে প্রত্যেকটা ছাপের মানে আলাদা। গোয়েন্দাগিরি একটা বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানের অনেক বিভাগের মধ্যে একটা বিভাগ হল পায়ের ছাপের মানে বার করা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর দরকারি এই বিভাগটাই সবচেয়ে অবহেলিত হয়ে রয়েছে ডিটেকটিভ সায়েন্সে। আমি কিন্তু বরাবর বেশি জোর দিয়েছি বিশেষ এই আর্টের ওপর–শিখেওছি অনেক। পায়ের ছাপের মানে বার করা আমার দ্বিতীয় প্রকৃতি বলতে পার। কনস্টেবলদের গোদা পায়ের ভারি ছাপ দেখলাম ঠিকই, এও দেখলাম যে তার আগে আরও দু-জন লোক বাগানের কাদা মাড়িয়ে বাড়ির ভেতরে গেছে। আগে গেছে বুঝলাম খুব সহজে। এদের পায়ের ছাপে অনেক জায়গায় চাপা পড়েছে পুলিশ কনস্টেবলের ভারী পায়ের ছাপে। তাই সঙ্গেসঙ্গে অনুমান করে সিদ্ধান্তে পৌঁছে বলেছিলাম, নৈশ আগন্তুক দু-জনের একজন অদ্ভুত রকমের ঢ্যাঙা–দুটো পায়ের ছাপের মধ্যে অতখানি ফঁক থাকাটাই তার প্রমাণ–আর একজন শৌখিন পুরুষ–বুটের ছাপ ছোটো হলেও বাহারি। এইভাবেই পেলাম আমরা যুক্তি-শৃঙ্খলার দ্বিতীয় গ্রন্থি।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার পর শেষ সিদ্ধান্ত যাচাই করা হয়ে গেল সুটপরা লোকটাকে মেঝের ওপর দেখে! ঢ্যাঙা লোকটাই তাহলে নাটের গুরু। খুন করে লম্বা দিয়েছে–অবশ্য শৌখিন ব্যক্তিটি খুন হয়েছে বলেই যদি সাব্যস্ত হয়। মৃত ব্যক্তির গায়ে ক্ষত নেই, কিন্তু মুখে বিভীষিকা আছে। আসন্ন মৃত্যুর খবর সে পেয়েছিল। হার্টফেল অথবা স্বাভাবিক কারণে হঠাৎ যারা মারা যায়, তাদের মুখে কখনো বিভীষিকা বা উত্তেজনা ফুটে থাকে

না। ঠোঁট শুকলাম। একটা তেঁতো গন্ধ পেলাম। এই থেকে গেলাম বিষ-প্রয়োগের সিদ্ধান্তে। বিষটা দেওয়া হয়েছে গায়ের জোরে মুখ তাই অমন বীভৎস। ঘৃণা আর আতঙ্ক অমন প্রকট। এই হল গিয়ে আমার তৃতীয় সিদ্ধান্ত। অন্যান্য পরিণতির সম্ভাবনা বাদ দিতে দিতে পৌঁছেছিলাম এই সিদ্ধান্তে। এটাও একটা পদ্ধতি। কেননা আর কোনো অনুমান দিয়েই এই পরিণতি সম্ভব হচ্ছে না। এ-জিনিস এর আগে কখনো শোননি ভেবো না যেন। অপরাধ ইতিহাসে গায়ের জোরে বিষ খাওয়ানোর ঘটনা নতুন কিছু নয়। যেকোনো বিষবিজ্ঞানীকে জিজ্ঞেস করলেই সঙ্গেসঙ্গে দুটো উদাহরণ শুনিয়ে দেবে! একটা ওডেসা-র ডোলাস্কি মামলা। আর একটা পেলিয়ারের লেটুরিয়ার।

এরপর এল সবচেয়ে বড়ো চিন্তা। কেন এই খুন? লুঠপাটের নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল না। কিছুই খোয়া যায়নি। তাহলে রাজনৈতিক হত্যা? স্ত্রীঘটিত হত্যাও বিচিত্র নয়। প্রশ্নটা ভাবিয়ে তুলল আমাকে। গোড়া থেকেই আমি অবশ্য শেষ সম্ভাবনার দিকে বেশি ঝুঁকেছিলাম। রাজনৈতিক গুপ্তঘাতকরা যা হোক করেই গা-ঢাকা দেয়। খুনটাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু এই খুনের কর্তাটিই খুন করেছে বেশ তারিয়ে তারিয়ে এবং সারাঘরে নিজের চিহ্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে গেছে যাতে পরে বোঝা যায় আগাগোড়া ঘরের মধ্যেই ছিল সে-উদ্দেশ্যটা তাহলে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ। গর্হিত অন্যায়ের শোধ তুলে গেছে কেউ ধাপে ধাপে খুন করেছে–হট করে মেরে ঝট করে পালায়নি। দেওয়ালের লিখন দেখে অনুমানটা আরও গভীর হল। ধোঁকা দেওয়ার স্পষ্ট চেষ্টা। আংটিটা আবিষ্কারের পর আর কোনো সন্দেহই রইল না। জবাব মিলল প্রহেলিকার। হত্যাকারী আংটি বার করেছিল কোনো একটি মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে সে-মেয়ে অকুস্থলে তো নেই-ই, ধরাধামেও হয়তো নেই। কথাটা মাথার মধ্যে আসার

সঙ্গেসঙ্গে গ্রেগসনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ক্লিভল্যান্ডে পাঠানো টেলিগ্রামে মি. ড্রেবারের অতীত জীবন সম্পর্কে খবর জানতে চাওয়া হয়েছে কিনা। তোমার মনে আছে নিশ্চয়, গ্রেগসন বলেছিল–না।

খুঁটিয়ে ঘর পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে পেলাম আরও কয়েকটা খবর। আমার পূর্ব অনুমানের অকাট্য প্রমাণ। যেমন, হত্যাকারীর উচ্চতা কতখানি, সে ত্রিচিনোপল্লী চুরুট খায় এবং তার নখ বেজায় লম্বা। ধস্তাধস্তির লক্ষণ না-পাওয়ায় রক্তপাতের কারণও ভেবে নিয়েছিলাম। উত্তেজনার সময়ে হত্যাকারীর নাক থেকেই রক্ত ঝরেছে ঘরময়। ছিটানো রক্তের দাগের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিল হত্যাকারীর পায়চারি করার ছাপ একই লাইনে গিয়েছে। গায়ে অনেক রক্ত থাকলে উত্তেজনার মুহূর্তে কারো নাক দিয়ে এভাবে রক্ত ঝরে। এই থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, গুপ্তঘাতক সম্ভবত বিরাটদেহী, লালমুখো পুরুষ। সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল সে-প্রমাণ পরে পেয়েছি।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে গ্রেগসন যা উপেক্ষা করেছে, মন দিলাম সেই কর্তব্যে। টেলিগ্রাম পাঠালাম ক্লিভল্যান্ডের পুলিশ প্রধানকে। বেশি কথা না–জানতে চাইলাম শুধু একটা খবর এনক ড্রেবারের বিয়ের সময়ে চাঞ্চল্যকর কিছু ঘটেছিল কিনা–এক উত্তরেই পৌঁছে গেলাম শেষ সিদ্ধান্তে। ড্রেবার নাকি পুলিশের শরণাপন্ন হয়েছিল প্রেমের ব্যাপারে এক পুরোনো প্রতিদ্বন্দ্বীর কবল থেকে বাঁচবার জন্যে। নাম তার জেফারসন হোপ। লোকটা নাকি এখন ইউরোপে। হত্যারহস্যের চূড়ান্ত সূত্র হাতের মুঠোয় পেয়ে উঠে পড়ে লাগলাম হত্যাকারীকে জালে ফেলবার চেষ্টায়।

মনে মনে আগেই ভেবে নিয়েছিলাম, ড্রেবারের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে যে ঢুকেছিল, ঘোড়ার গাড়িটাকেও চালিয়ে এনেছিল সে। রাস্তায় ঘোড়ার পায়ের ছাপ দেখেই এসেছিলাম সেই সিদ্ধান্ত। ঘোড়াটা এলোমেলো ভাবে হেঁটেছে–লাগাম ধরে কেউ বসে থাকলে ঘোড়া এ-রকম খেয়ালখুশি নিয়ে চলে না। গাড়োয়ান তাহলে ছিল কোথায়? নিশ্চয় বাড়ির মধ্যে। গাড়ি ছেড়ে বাড়ির ভেতর ছাড়া আর কোথাও যাওয়া তো সম্ভব নয়। তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে পাগল ছাড়া কেউ খুন করে না। অর্থাৎ গাড়োয়ানই তাহলে খুনি। তা ছাড়া লন্ডন শহরে অগোচরে কারো পেছন নেওয়ার মতলব থাকলে গাড়োয়ান হওয়াটাই কিন্তু সবচেয়ে সুবিধাজনক! এই সব পয়েন্ট আর সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে একটাই চরম সিদ্ধান্তে আসা যায় এবং তা হল বিরাট এই শহরের বিভিন্ন গাড়ির আচ্ছায় জেফারসন হোপ নামধারী এক গাড়োয়ানকে খোঁজ করা।

এই নামের কোনো লোক যদি সত্যিই থাকে গাড়ির আচ্ছায়, রাতারাতি নাম পালটে উধাও হওয়া বোকামি হবে তার পক্ষে। কারো মনে যাতে সন্দেহের আঁচ না-লাগে, তাই দিন। কয়েক গাড়ি নিয়ে বেরোতে হবে যাত্রীর সন্ধানে। হঠাৎ ধরাচুড়ো পালটালেই তো লোকের চোখে পড়বে। ছদ্মনাম নিয়েছে এমন সন্দেহ করারও কোনো কারণ নেই। যে-দেশে কেউ তার আসল নামই জানে না, সে-দেশে নকল নাম নেওয়ার কোনো যুক্তি আছে কি? রাস্তার বাউন্ডুলে ছোঁড়াগুলোকে লাগিয়ে দিলাম সেই কাজে। লন্ডনে সবকটা গাড়ির আড্ডার মালিকদের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে লাগল জেফারসন হোপের পেয়েও গেল শেষপর্যন্ত। কীভাবে কত তাড়াতাড়ি তারা নিয়ে এল জেফারসনকে এবং কীরকম নাটকীয়ভাবে বাগে আনলাম তাকে, সে-দৃশ্য এখনও টাটকা তোমার স্মৃতিতে। স্ট্যানজারসনের খুন হওয়াটা নেহাতই অপ্রত্যাশিত কিন্তু তা আটকানোর পথও আর ছিল

না। ছুরি খেয়ে মরেছিল বলেই না বিষ-বড়িগুলো পেলাম আমার পূর্ব অনুমানেরও অকাট্য প্রমাণ হাতে এল। তাহলেই দেখ, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই একটা ধারাবাহিক ব্যাপার যুক্তিসিদ্ধ অনুমানের শেকলও বলতে পার ফাঁক কোথাও নেই।

অপূর্ব। সোল্লাসে বললাম। তোমার প্রতিভার জনস্বীকৃতি দরকার। কেসটা ছেপে বার করা দরকার। তুমি যদি না-লেখ, আমি লিখব।

তোমার যা মন চায় তাই কর। এই দ্যাখো! আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিয়ে বলল হোমস, দ্যাখ! পড়ে দ্যাখ!

কাগজটা সেইদিনের একো পত্রিকা, আঙুল দিয়ে যে-খবরটা দেখাল হোমস, এই :

মি. এনক ড্রেবার এবং মি. জোসেফ স্ট্যানজারসনকে হত্যার অভিযোগে ধৃত হোপ নামক লোকটির অকস্মাৎ মৃত্যুতে চাঞ্চল্যকর একটি বিচার কাহিনি থেকে বঞ্চিত হল দেশের মানুষ। মামলাটির বিশদ বিবরণ কোনোদিনই আর উদঘাটিত হবে না। বিশ্বস্ত সূত্রে আমরা জেনেছি, তা এই : জোড়া খুনের পেছনে নাকি বহু পুরোনো ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা আছে, সেইসঙ্গে আছে একটা রোমান্টিক কাহিনি এবং করুণ উপাখ্যান। নিহত দুই ব্যক্তিই নাকি যৌবনকালে সন্তদের দেশবাসী ছিলেন। হোপ নামক মৃত আসামি নাকি সল্টলেক সিটি থেকেই এসেছে। মামলাটায় আর কিছু লাভ না-হোক, একটা লাভ হয়েছে। ব্রিটিশ পুলিশের দক্ষতা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিদেশিদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে পুরোনো ঝগড়ার মীমাংসা যেন দেশের মাটিতেই

করে আসা হয় ব্রিটিশ মাটিতে করতে গেলে ঝকমারি অনেক। ব্রিটিশ পুলিশের আশ্চর্য এই দক্ষতার পূর্ণ কৃতিত্ব যে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের দুই স্বনামধন্য তরুণ গোয়েন্দা সর্বশ্রী লেসট্রেড এবং গ্রেগসনের প্রাপ্য–এ-খবরও আর গোপন নেই। আসামিকে ধরা হয়েছে শার্লক হোমস নামক শখের গোয়েন্দার ঘরে। গোয়েন্দাগিরিতে ভদ্রলোক যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভার চিহ্ন দেখিয়েছেন এবং উপর্যুক্ত উপদেষ্টা পেলে ভবিষ্যতে আরও দক্ষতা দেখাবেন আশা করা যায়। কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তরুণ পুলিশ গোয়েন্দা দু-জনকে একটা প্রশংসিকা দেওয়া হবে, এ-আশা করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না।

হাসতে হাসতে শার্লক হোমস বললে, কী হে, শুরুতেই বলিনি তোমাকে? এ স্টাডি ইন স্কারলেট তদন্তের ফল এটাই–ওদের দুজনকে প্রশংসিকা পাইয়ে দেওয়া।

আমি বললাম, মন খারাপ কোরো না। সব ঘটনাই লিখে রেখেছি আমার খাতায়–দেশের মানুষ শিগগিরই তা জানবে। যদ্দিন তা না-হচ্ছে, মনকে ঠান্ডা রেখো শুধু একটা কথা ভেবে : এ-জয় শুধু তোমারই।